বিজ্ঞান ও দর্শন

শুনে আসছি-যেখানে বিজ্ঞানের শেষ,সেখান থেকেই নাকী দর্শনের আরাম্ভ।

ব্যাপারটা মনে হয় এটা আমাদের দেখার অপূর্ণতাবশত একটা উক্তি।

বিজ্ঞানে প্রথম থেকেই দর্শন উপস্থিত!

মহেন্দ্র-দৃষ্টি দানে,মানে দর্শন পদ্ধতির সাহায্যে,এটা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি।

তিনি বলছেন,গাছের কথা বলতে গেলে,তোমার সম্পূর্ণ মনটাকে ঐ গাছের ভেতর প্রবেশ করাতে হবে,আর তবেই তুমি যেটা বলবে,সেটা হবে ঠিক ঠিক ঐ গাছের কথা।

আর এটা না করতে পারলে,ঐ খানিকটা হবে গাছের কথা আর বাকিটা তোমার কথা।

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র এই একই কথা বলছে।
বহুকিছুর ওপর সংযমে,সেই সেই শক্তি অর্জন।

তথাকথিত বিজ্ঞানের দুটো যে ধারা-তাত্বিক এবং ব্যাবহারিক,এর মধ্যে ব্যাবহারিকটার কার্যপ্রণালী আমরা তো সবাইই দর্শন করি আর ঐ তাত্বিক ধারায় মনোনিবেশ করলেই,মনের পরিবর্তন সাধিত হয় আর ভেতরে নানান ছবির পরিবর্তন হয়,অর্থাৎ সেইসব ছবি আমরা দর্শন করে থাকি।

এখন দেখতে হবে,আমরা ঠিক কোন বিষয় এবং অবস্থাকে দর্শন আখ্যা দিয়ে থাকি।

যা স্বজ্ঞানে চেতনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেই ধরণের অনুভূতিকে।

কিন্তূ পূর্বের দর্শনগুলি কি চেতনাবিহীন ছিল?

মোটেই নয়।

শুধু আমরা বুঝতে পারি নি বা অনুভব করতে পারিনি এইমাত্র।

তাহলে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে যে তথাকথিত বিজ্ঞান থেকে প্রথাগত দর্শন সংক্রান্ত সবকিছুই দর্শনের আওতায় এসে পড়ছে।

এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত কি হতে পারে আধুনিক পটভূমিতে...

কোনো কিছু দর্শনের বিশ্লেসন করলে,যে ব্যাখ্যা আমরা পাই সেটার নামই... যথার্থ বিজ্ঞান।
[15:55, 24/12/2024] Bon: ধর্ম আর বিজ্ঞানের সম্পর্ক

যদি বলা হয় ঘটিটাও রামকৃষ্ণময় আর বাটিটাও,তাহলে কো পাগলের শ্রেণীতে ফেলা হবে,সেই নিয়ে সবাই ভাববেন.. তাই তো?

কিন্তু সবই যদি ঈশ্বর হন আর ঈশ্বর সর্বভাবময় ও সর্ব শক্তিমান হন আর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ স্বয়ং সেটিই হন... তাহলে কি ধারণা বদলাবার সন্ধিক্ষণ এটাই?

আজ মানি বা না মানি,আজ বুঝি বা না বুঝি... একদিন কিন্তু এই অনুভবই সবার হবে!

যেভাবে হবে-সেটার নাম প্রকৃত ধর্ম।

কি করে এই ব্যাপার সংগঠিত হতে পারে,এটা জেনে গেলেই-হয়ে যায় বিজ্ঞান।

অতএব এর থেকে সিদ্ধান্ত কি হতে পারে?

মূর্তিমান ধর্ম... ধরা ও ছোঁয়ার বস্তু,তা কোন দেহধারী কে স্থূল চোখে দেখে,মানস চক্ষু তে দর্শন করে বা শুধুমাত্র তাঁর উপস্থিতির অনুভব করেও বুঝে নেওয়া সম্ভব।

এক্ষেত্রে এই সবগুলো ব্যাপার একসঙ্গেই চলেছে!

তাই না ওনারা বলছেন,বিশেষ করে শ্রী শ্রী মা স্বয়ং বলছেন.. মলয়ের বাতাস খুব বইছে।

এরপর আর কি বলার থাকছে?

শ্রী শ্রী ঠাকুরের ধাতু দ্রব্য স্পর্শ করলে হাত,বিশেষ করে আঙ্গুল বেঁকে যেত।

কিন্তু শ্রী শ্রী মায়ের ক্ষেত্রে,তা হতো না।

আর মা নিজেই বলছেন,তিনি ও ঠাকুর আভেদ!

আসলে সেই ব্রহ্ম আর শক্তির কথাই এসে গেল,তাই না?

না এসে যে উপায় নেই।

যদি স্তরের পর স্তর পেরিয়ে এই অভূতপূর্ব ব্যাপার বুঝতে হয়,তাহলে কিছু আচরণ বিধি পালন করার প্রয়োজন হয়.. এই পালন করাটাই ধর্ম পালন।

শুধুই বিশ্বাসে যদি উপরে উক্ত সিদ্ধান্ত কেউ মেনে নিতে পারেন,সেক্ষেত্রে তিনি বুঝেসুঝে বিশ্বাসী ও একজন ভক্তিমার্গের মানুষ।

এই যে রামকৃষ্ণময় বলা হল,এটা ঈশ্বরের অনন্ত ভাবের ভিত্তিতে,কারণ তিনি অনন্তভাবময়।

শক্তি কিন্তু একই থাকে!
সেই মহাচালিকা শক্তিই.. এযুগের বিশ্ব জননী শ্রী শ্রী মা সারদা।

বাকি সবাইকে নিয়ে একটা সৌরমন্ডল এর মতন, যেখানে স্বামীজী, মহেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দজী এবং অন্যান্যরা গ্রহাদির মতন,ওনাদের কেন্দ্র করে নিরন্তর ঘুরছেন!

অর্থাৎ একটু একটু বিজ্ঞানের আভাস যেন পাওয়া যাচ্ছে... তাই তো?

এটা নিয়ে যত বেশী বেশী ভাবা যাবে... ততই যা তথ্য বেরোতে থাকবে, তা হয়ে যাবে নানান বৈজ্ঞানিক সূত্র।

পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ এইরকম বহু সূত্র আমাদের জন্য শুধু রেখেই যাননি... পুরোপুরি এক নতুন জগৎ উন্মোচন করে দিয়ে গেছেন আর সেইজন্যই তাঁর অমর "শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের অনুধ্যান"বইটিতে আগামীর ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন... যুগঈশ্বর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কে...
[15:55, 24/12/2024] Bon: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

এ পূজনীয় মহেন্দ্রনাথের এক অতুলনীয় সৃষ্টি।

এই মহেন্দ্র বিজ্ঞান আগামীর অগণিত মানুষ তথা বিভিন্ন জাতির পথ প্রদর্শক রূপে কাজ করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

যখন মানুষ নানান পথে বহুকিছুর অনুসন্ধান চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বে-ঠিক তখনই মহেন্দ্রনাথের বইগুলোর প্রতি প্রথমে তারা আকর্ষণ অনুভব করবে।

তাদের এযাবৎ প্রসূত ধারণা বদলাতে শুরু করবে আর সত্যের স্বাদ পেয়ে, বিভোর হয়ে আরও জানার ও বোঝার চেষ্টা অক্লান্ত ভাবে চালাবে।

প্রচলিত এতদিনের বিশ্ব রহস্যের প্রহেলিকা থেকে যত মুক্তিলাভ ঘটবে,ততই যথার্থ জ্ঞানে হৃদয় পূর্ণ হবে।

এই সুদিন আসবেই আসবে, কারণ রজগুণের স্থায়ীত্ব বেশী দিনের জন্য হয় না।

মহেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান সিরিজ-আধুনিক ও প্রাচীন ভারতীয় ভাবধারার শুধু মিশ্রণই ঘটায় নি, উপরন্তু এক নতুন তত্ব সমন্বিত অতি উন্নত ও আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা করেছে,যা সর্ব শ্রেণীর মানুষের পক্ষে অনুধাবন ও অনুভব করা সহজেই সম্ভব।

এই অনুভব ধ্যানের, জ্ঞানের এবং জীবন সমস্যা সমাধানের।

আমরা যথাসম্ভব এই মহামূল্যবান মহেন্দ্র বিজ্ঞানের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় ঘটাতে চেষ্টা করবো।
[15:55, 24/12/2024] Bon: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

আমরা এই অতি গুরুতপূর্ণ দর্শন পর্বের আলোচনায় গবেষণা প্রসূত নানান ছোট ছোট যন্ত্রের ব্যাখ্যার মাধ্যমে–পূণ্যদর্শনের আভ্রান্ত তত্ত্বগুলোর প্রমাণ উপস্থিত করার চেষ্টা করবো।
এছাড়া আরও কিছু যন্ত্রের দর্শন ও কার্যকারিতাও আলোচিত হবে এই পর্যায়ে।
পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ যেরকম ভবিষ্যতের চাহিদার কথা ভেবে, তাঁর অতি মূল্যবান অনুভূতি প্রসূত বক্তব্য সব রেখে গিয়েছিলেন আর আজ আমাদের মতন অতি সাধারণ মানুষের দল তা সাদরে গ্রহণ করে ধন্য হচ্ছে, ঠিক সেই ভাবধারা অনুসরণ করে,তাঁরই এইসব সম্প্রসারিত বক্তব্য এখন প্রকাশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এতদিনের বহু নিম্নতর সত্য কে, চূড়ান্ত সত্য সব ধরে নিয়ে যে বিপদ সাগরে আজ আমরা পতিত হয়েছি, পথ খুঁজে পাচ্ছিনা–নিজেদের উদ্ধারের,সেই পটভূমিকায় এই মহেন্দ্র বিজ্ঞান আশা রাখি,বহু নিবেদিত প্রাণে আশার আলো জ্বালিয়ে দেবে।
বিশেষ করে বয়েসে যারা তরুণ তাদের নির্মল প্রাণে।

যে যন্ত্রের চিত্র এখানে প্রদর্শীত হচ্ছে, সেটার নামকরণ করা হয়েছে.. Near Vision Instrument বা নিকট দর্শন যন্ত্র।

আমরা তো বলে থাকি.. ঈশ্বর নাকী আমাদের সর্বদাই খুব কাছেই আছেন, আবার কেউ কেউ বলেন তিনি আমাদের ভেতরেই অবস্থান করছেন, আবার বিশেষজনেরা আরও এগিয়ে বলেন.. তিনি সর্বত্রই বিরাজমান!

তার মানে সোজা কথায় আমরা কি বুঝলাম?

প্রথমে শুধুই শুনলাম আর বুঝলাম এটুকুই যে... এক এক জনের কাছে ঈশ্বর এক এক ভাবে বিরাজমান, গ্রহনীয় এবং দর্শন ভিন্নতায় ঈশ্বরের নানান ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে।

তাহলে কোন ব্যাখ্যাটা ঠিক?

যদি বলা হয়.. সবকটাই, আপনারা মানবেন...

মনে হয়, এই মানার জন্য আপনারা কিছু না কিছু চিন্তা করতে শুরু করবেন আর একসময় নিজের মতন করেই তাঁকে ঠিক বুঝবেন।

মহেন্দ্রনাথ অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ... এসব নিয়ে বিশেষ আলোচনা না করে সোজাসুজি স্থূল স্নায়ুর স্পন্দন, সূক্ষ্ম স্নায়ুর স্পন্দন এবং কারণ স্নায়ুর স্পন্দন–এইসব ব্যাখ্যায় চলে গেলেন আর রচনাও সেইরকমই করলেন।

কেন?

আজকের মানুষের এক বৃহৎ অংশের সহজে যুক্তি সহকারে বোঝার জন্য।

কি বোঝা যাবে?

যথার্থ সত্য আর এর অনুবর্তী স্তরগুলি সমন্ধে।

এগুলো জানা কি জরুরি?

আমরা শুধু এইগুলি জানা ও বোঝার জন্যই বারবার জন্মাচ্ছি আর ছোটাছুটি করছি।

এই জানার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক কোথায়?

এগুলি জানলেই ঈশ্বর এবং তাঁর নানান প্রকাশ সম্মন্ধে ধারণা একেবারে স্বচ্ছ হয়ে যায়।

এই যন্ত্রের উপস্থাপনা কেন?

শুধু আমাদের অস্বচ্ছ দৃষ্টি কে স্বচ্ছ করার জন্য।

এটাই বিজ্ঞান ভিত্তিক দর্শন আর তাই আমরা এই মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন পর্যায়ে সর্বজনের উপযোগী করে তাঁর মহামূল্যবান তত্ব গুলিকে ব্যাখ্যা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

এই যুগ যন্ত্রপাতি অর্থাৎ প্রযুক্তির যুগ, তাই যন্ত্রদর্শনের ভেতর দিয়ে আমরা মহেন্দ্র স্নায়ু দর্শনের আস্বাদ গ্রহণ করবো এবং পরিপূর্ণতা লাভের চেষ্টা চালাবো।
[15:56, 24/12/2024] Bon: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

মহেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান সিরিজ,সত্যিই আমাদের এতদিনের প্রচলিত ধারণাকে আমূল বদলিয়ে দিচ্ছে।

যা ধ্রুব সত্য বলে সব জেনেছিলাম, পড়েছিলাম--সে সব কোন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই।

কোথাও বলছেন পৃথিবীর ভেতরটা ফাঁকা তো কোথাও বলছেন বিদ্যুৎই হল কেন্দ্রীয় শক্তি, আবার এমন কাজও করছেন যাতে পরমাণু কোনো সাড়াশব্দ না করেই বিশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে.. শাস্ত্র কে সামনে এনে দাঁড় করিয়ে প্রমাণ করছেন দ্বাণু, ত্রসোরেণুর অস্তিত্ব।

কখনো বলছেন কালো থেকেই সব রঙের উৎপত্তি তো কোথাও বলছেন আবরণী শক্তির কথা।

তাঁর বিজ্ঞানটা পুরোপুরি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতার প্রত্যক্ষ নানান উপলব্ধির ব্যাখ্যা মাত্র।

তাই এই বিজ্ঞান এই চর্চা শুরু করা মাত্রা ধ্যান এসে উপস্থিত, আবার ধ্যানী হলেই–এই বিজ্ঞান বোঝা খুব সহজ।

কিন্তূ মধ্য পন্থা কিছু আছে কি, বিশেষ করে আমাদের মতন সাধারণ মানুষজনের জন্যে?

হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি তা রেখেছেন আর যেটা হল জপ করা।

আশ্চর্য ব্যাপার! বিজ্ঞান শিখতে গেলে জপ করতে হবে?

হ্যাঁ, মহেন্দ্রবিজ্ঞান বা যথার্থ বিজ্ঞান শিখতে গেলে, এটা করা আবশ্যক।

কিভাবে এটা করা যাবে?
কেন, প্রথমে সা,রে,গা, মা শেখার মতন করে, যে কোনো নাম নিয়ে শুরু করা আর বার বার অভ্যাস করা।

এরপর বেশকিছুটা রপ্ত হয়ে যাবার পরে,স্কেল চেঞ্জ করতে শেখা... মানে একটা নামের জপ করতে করতে সন্তরর্পনে অন্য কোনো নামে চলে যাওয়া।

এটা যত প্রাকটিস করা যাবে, ততই নিজের ভিতরের বিভিন্ন স্নায়ুর স্পন্দনমাত্রা পরিবর্তন করার সুবিধে হয়ে যাবেই।

তার মানে যতই একই রেখায় শক্তি কে রাখা যাবে, ততই সাম্য অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াও যাবে, যার নিট ফল.. স্থিতধি হওয়া।

এই স্থিতধি অবস্থায় কেবলমাত্র সত্য দর্শনলাভ হয়।

দর্পনে ঠিক ঠিক প্রতিবিম্ব পড়ে।

বিভিন্ন ভাবের জপ সহায় চিন্তনে যে দর্শনলাভ হয়, সেটাই ভাবদর্শন আর এই দর্শন যদি কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী হয়–তাহলেই তা নিয়ে যাবে ভাব সমাধিতে।

সমাধিপাদ কে তাই অধ্যাত্ব বিজ্ঞানের অন্তরভূক্ত এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হিসেবেই গণ্য করা হয়ে থাকে।

মহেন্দ্রনাথ তাঁর উদ্ভাবিত ও দর্শীত তত্ব গুলিকেই বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করে, তাঁর বিজ্ঞান সিরিজটি গঠন করেছেন।

এতে তাঁর যেকোনো একটা তত্ত্বের চিন্তনে প্রথমে চকিত দর্শন লাভ হবার সম্ভাবনা প্রবল।
এরপর ঐ নবভাব দর্শনের --পুনঃদর্শনের আকাঙ্খা ও প্রচেষ্টা ব্যাক্তিকে চঞ্চল দর্শনের অবস্থায় নিয়ে যায়।

এতেও ব্যাক্তির সন্তোষ না আসায়,সে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে --এরফলে প্রভুত শক্তি সঞ্চিত হয় আর ঐ বিশেষ ভাবের বিশেষ স্নায়ুটি পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হয় আর সাথে সাথেই... স্থির দর্শন অবস্থা লাভ হয়,যা গভীর ধ্যান বা ভাব-সমাধির সামিল।

এটিই মহেন্দ্রবিজ্ঞান শিক্ষার ও উপলদ্ধির উপায় বলেই মনে হয়।
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

তিনি to কণার পারে চলে গিয়ে-কণা সৃষ্টির কারণ দর্শন করছেন আর পরে সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ করলেন তাঁর অনুগামীদের সহায়ে।

এ এক বিচিত্র ব্যাপার!অন্তত ইদানিং কালের পটভূমিকায়।

তিনি তাহলে সেইকালে কি অবস্থায় রইলেন,এই ব্যাপারে কি কোনো ধারণা পোষণ করা সম্ভব?

তাঁরই প্রদর্শীত পথ অবলম্বনে কিছুটা করার চেষ্টা করা যায়।

তিনি রশ্মি তে নিজেকে পরিবর্তিত করেছেন,কিন্তূ পুরোটা নয়... তাঁর খানিকটা স্বত্তার।

বাকি সত্তাকে রেখেছেন-পর্যবেক্ষক রূপে।
এই প্রযুক্তির প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি আলোচনা করে গেছেন এবং আমাদের এই অদ্ভুত ক্রিয়াটি শিখে নেবার কথাও বলেছেন।

কি অদ্ভুত এই প্রক্রিয়া।

আমাদের প্রাচীন ঋষি ও মুনিদের দর্শন প্রণালী নিশ্চিতভাবে এটাই যে ছিল,বুঝতে আর এখন বেগ পেতে হয় না,আর সামনে প্রজ্জলিত মহেন্দ্রনাথ স্বয়ং... প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরুপ।

তিনি রশ্মিতে বিভাজিত হয়ে পড়লেন,সেই রশ্মি কে আবার পুনরায় চিন্তন-বিভাজনের মাধ্যমে একের অধিক রশ্মিতে পরিণত করলেন... এবার ঐ রশ্মিগুলিকে নিক্ষেপন্তে একটি বিন্দুতে একত্রিত করার প্রয়াস করলেন... ধীরে ধীরে তিনটি তলের সৃষ্টি রুপ পরিগ্রহ করতে শুরু করল।

যেন এক অতি ক্ষুদ্র পুরো গোলাকৃতি নয়,তাঁর ভাষায় কিছুটা ডিম্বাকৃতি একটি কণা।

বলা যেতে পারে এই প্রকান্ড ব্রভান্ডের এই অতি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ!

যা আছে ভান্ডে, তাই আছে ব্রভান্ডে... ভারতের এই মহাবাণী মোটেই কোনো কাকতলিও ব্যাপার নয়.. এ সৃষ্টিতত্বের অন্দরমহলের বার্তা।

সিদ্ধান্ত এই... খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।

দেখা মিলবে... বিশ্বর।
সাধ পূর্ণ হবে শিষ্যর--মহেন্দ্র চরণছোঁয়ার শক্তিপাতে!

এই শক্তিপাত যুগ যুগ ধরে শ্রীগুরুরাই করে থাকেন পরমেশ্বরের কার্যের বাহকরূপেই আর সেই ধারা মন থেকে মনে প্রবাহিত হতে হতে কখনো বা মিশে যায় চৈতন্য-সাগরে আবার কখনো বা ভেসে উঠে ক্রীড়া করতে শুরু করে.. এই জগৎরূপে।

যে জগতের অস্তিত্ব আছে-আবার নেই!
[12/24, 3:40 PM] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

মহেন্দ্রনাথের স্নায়ু-বিজ্ঞান কে আমরা প্রধানত দুটো ভাগে ভাগ করে নিতে পারি।

১) দৃশ্বমান স্নায়ু
২) অদৃশ্য স্নায়ু

স্থূলদেহের-স্থূলস্নায়ু দৃশ্বমান, কিন্তু চিন্তার স্নায়ুসকল সব অদৃশ্বে দিবারাত্র কাজ করে চলেছে।

পূজনীয় জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা, বশী সেন প্রমুখ মহান মানুষের কথা মহেন্দ্রনাথের রচনায় বারবার ঘুরেফিরে এসেছে।

গাছের স্নায়ু, ধাতুর স্নায়ুর বিভিন্ন কথা ও চিত্র জগদীশচন্দ্র তাঁর নানান রচনায় তুলে ধরেছেন আর পরীক্ষা সহযোগে প্রমাণও উপস্থাপিত করেছেন।

এই ব্যাপারে ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে দীর্যদিন নানানভাবে সাহায্য করেছিলেন,এ কথা আমরা অনেকেই জানি।
কিন্তু এই মহান বিজ্ঞানের সারসত্য না বুঝে,কি কেউ এই সাহায্যের হাত বাড়াতে পারেন?
কখনোই না।

আবার গভীর চিন্তন এ অভ্যস্ত না হলে,কি কেউ এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে রচনার সম্পাদনা করতে পারেন?
একেবারেই সম্ভব নয়,তাই পূজনীয়া নিবেদিতার অন্তরদৃষ্টি প্রধান সহায়ক হয়েছিল,এই মহাকর্মের আন্বেশ্বণে ও উদযাপনে।

চিন্তন যে রেখা সহযোগে ভবিষ্যৎ এর চিত্র সুন্দরভাবে মানস চক্ষে ধরা দিতে পারে, এরও উপমা নিবেদিতা স্বয়ং।

পূর্ণ চৈতন্যতে সু প্রতিষ্ঠিতা তাই তাঁর ডুবতে-চলেছে জীবন তরীর বর্ণনা দিচ্ছেন আর এও বলছেন... দেখবেন তিনি নতুন সূর্য।

ধৈর্যর বাঁধ ভেঙে যাবার পর তাই রেম কে মহেন্দ্রনাথ বললেন.. তিনি নিজেই ছিলেন ভারতবর্ষ।

তাঁর গুরু ছিলেন স্বয়ং বিশ্ব।

আর গুরুর গুরু কে ছিলেন, তা তো আমরা জানি সকলেই।

বসুবিজ্ঞান মন্দিরে ঢুকলেই, প্রথমেই বাঁদিকে নিবেদিতার ফ্রেস্কো।
আর মন্দিরের ওপরে জ্বলজ্বল করছে জ্যোতির্ময় বজ্র চিহ্ন।
[12/24, 3:40 PM] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

গতি রয়েছে মানেই, পথ রয়েছে।
বায়ু রয়েছে মানেই, দিক রয়েছে।
আমি রয়েছি মানেই, তুমিও থাকছে।

কিন্তু ঐ সবগুলোর কোনোটাই যদি না থাকে তাহলে কি কিছু সত্যিই থাকবে?

কে বলতে পারে এই কথা আর কাকেই বা বলবে...
সেকি? তার মানে তো আমি-তুমি ব্যাপারটা তো থেকেই যাচ্ছে।

হ্যাঁ যাচ্ছে।
কিন্তু যদি এটা উধাও হয়ে যায় আর এই উধাও হবার খবরও পাওয়া যায় তাকে কি বলা যাবে? বিজ্ঞান... যা কিনা সাধারণ জ্ঞানের বাইরের ব্যাপার।

এই বিজ্ঞানের সবিস্তারে বর্ণনা আমরা পাই মহেন্দ্রনাথের রূপ, জীবন এবং রচনার ভেতর।

এ থেকে কি বোঝা গেল?

তিনি বিজ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, যথার্থ বিজ্ঞানীর জীবন যাপন করেছেন আর স্বমহিমায় ছিলেন ভাস্বর... এটি তাঁর রূপের বৈশিষ্ট।
তাঁকে আলাদা করে চেনার কোন দরকার ছিলোনা, এতটাই তিনি ছিলেন আলাদা... বিশেষরূপে জ্ঞান সমৃদ্ধ।

কি করে এরকম হয়?

ঘাত-প্রতিঘাত,গভীর অনুসন্ধান,ধ্যান প্রসূত চিন্তন ও সর্বোপরি সর্বশক্তিমানের ইচ্ছায় এমন পুরুষ সৃষ্ট হন।

জগতের প্রয়োজনে,লোকশিক্ষা তথা সর্বশক্তিমানের প্রজাপালনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই মহাসিদ্ধ ব্যাক্তিবর্গ প্রকটিত হন আবার অনন্ত-অদৃশ্য দেহ নিয়ে সর্বদা একদিকে ভাবস্থ থাকেন আর অন্যদিকে লোকহিতায়ে রত থাকেন।

এটাই তাঁদের অবস্থানের ক্ষেত্র এবং পুরো এক কল্প জুড়েই,এই স্থিতি বর্তমান থাকে।

১)অতএব আমরা চাইলেই তাঁর স্পর্শ লাভ করতে পারি।
২)যে কোনো যথার্থ প্রশ্নের,সঠিক উত্তর পেতে পারি
৩)কাজ করার নির্দেশ ও শক্তিলাভ করতে পারি।
৪)এগিয়ে চলার প্রেরণা ও অসাধারণ সব অনুভূতিলাভ স্বচ্ছন্দে করতে পারি।
৫)সর্বদা বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি।

এরবেশি সত্যিই কি আর কিছু চাই আমাদের?

মনে হয়না।

তার মানে পরিপূর্ণতালাভ করতে পারি আর তাতে অবশ্যই মিশে থাকবে আনন্দ।

এই আনন্দ কে কি বলা যায়?
বিজ্ঞানের-আনন্দ।

এরকম বলা হল কেন?

কারণ অতি বিশেষ অবস্থা কেউ প্রাপ্ত না হলে,এত কিছু তো পাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়।

উল্টোদিক থেকে দেখলে... এসব কিছু পেলে কি হয়?

তাঁর প্রত্যক্ষ আশ্রয়লাভ হয় আর তাঁর কিছু কিছু গুণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধার হওয়া যেতে পারে।

এতো সবকিছু যে হবার কথা,দেওয়া-নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে... এতো চোখে দেখা যাচ্ছে না!
হ্যাঁ,একদম ঠিক কথা।

মহেন্দ্রনাথের মতন ব্যাক্তিদের কাজ ঐ স্থূল দৃষ্টির ওপরের পর্যায় থেকেই সাধারণত শুরু হয়,আর তাই স্থূল চোখে দেখা যায় না।
তবে আমরা নিজেদের একটু সূক্ষ্ম স্তরে নিয়ে যেতে পারলেই... এইসব কিছু দেখা ও বোঝা নিশ্চিতভাবে যাবে।

তার মানে তো তাহলে এই জাগতিক তথাকথিত বিজ্ঞানের পরেও বিজ্ঞানের আরও আরও উচ্চ অবস্থা রয়েছে?

ঠিক তাই। খুব অল্প কিছু জেনে শুনেই আমরা বৈজ্ঞানিক বলছি,কিন্তু এখন থেকে বিজ্ঞানের পরিসরের আসল খবর মেলাতে আমরা যথার্থ বিজ্ঞানী পদমর্যাদার এক ব্যাক্তি তাঁকেই বলবো... যিনি চূড়ান্ত উচ্চ স্থান থেকে চূড়ান্ত নিম্ন স্থানে অনায়াসে বিচরণ করতে পারেন এবং প্রয়োজনে অপরকে এই মহান ও মাধুর্যমন্ডিত পথে চলার জন্য সাহায্যও করে থাকেন।

অতএব আমরা মনে মনে শপথ গ্রহণ করে, তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে এই মহা-মহেন্দ্র বিজ্ঞানের তথা মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শনের চর্চায় প্রবেশ করি।

[12/24, 3:40 PM] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

তিনি একদিন প্রাতে বোসপাড়ায় স্বামী সদানন্দ বা গুপ্ত মহারাজের কাছে গিয়ে উপস্থিত।
তিনি ওনাকে প্রণাম করতে গেলেন,গুপ্ত মহারাজ তো যুগপত অবাক ও অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন।

তখন মহেন্দ্রনাথ বললেন আরে আমি কি তোমাকে প্রণাম করছি? করছি সেই শক্তি কে যা স্বামীজীর কাছ থেকে এখন তোমার মধ্যে প্রবেশ করেছে!
এক আশ্চর্য ব্যাপার, মহেন্দ্রনাথ আগেরদিন, এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছেন আর তাই প্রাতেই পৌঁছিয়ে গেছেন শ্রদ্ধেয় গুপ্ত মহারাজের কাছে।

তিনি আরও বললেন, দেখ গুপ্ত, শক্তিকে পূজা করতে হয়।

এ থেকে আমরা কি বুঝলাম..

আসামান্য উচ্চস্তরের মহাপুরুষেরা এই সব দর্শন করতে সিদ্ধ এবং সেই অনুসারে তাঁদের ব্যবহার ও কর্মপদ্ধতি স্থির করে নেন।

আরও যেটা বোঝা গেল, সেটা হল, অগণিত মানুষের ও সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল কামনায়, এঁরা সর্বদা সজাগ থাকেন আর যেহেতু জানেন তাঁদের আগমনের হেতু।

এই অবস্থালাভের সঙ্গে,বিজ্ঞানের কি কোনো সম্পর্ক আছে?
অতি অবশ্যই আছে।

মহা শক্তির এই যে আদান প্রদান-এক আধার থেকে অন্য আধারে সঞ্চারিত হয় এবং যাঁরা এটা করতে সক্ষম,তাঁরা যে অসীম শক্তিভাণ্ডারের সঙ্গে সর্বদা যুক্ত এটা বলার প্রয়োজনীয়তা তো নেইই, উপরন্তু তাঁরা আধার বিশেষে... শক্তি সঞ্চারের মাত্রা, আধারের গ্রহণ যোগ্যতার পরিমাপ এবং নিজস্বভাব বুঝেই -অদৃশ্যে এই কার্য সম্পাদিত করেন।

কিন্তু এই আদান-প্রদান প্রক্রিয়া, সমস্তরের মহাপুরুষ অনায়াসে দর্শনে সক্ষম... প্রত্যক্ষ প্রমাণ:স্বয়ং মহেন্দ্রনাথ এই ক্ষেত্রে।

এই শক্তি প্রধানত জ্যোতি-রশ্মি রূপে নির্গত হয় আর গ্রহীতার হৃদয় লক্ষ্য করেই ধাবিত হয়।

এর মুখ্য কারণ,ঐ হৃদয় স্থানেই রয়েছে স্নায়ুর প্রধান জাঙ্কশন স্টেশন... যেখান থেকে অজস্র দিকে,অজস্র ভাবের পথ ও উপপথ অগণিত আধারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

হৃদয় তাই, স্পন্দন ধরণের কেন্দ্রস্থলও বটে।

এই সংযোগ প্রণালী, যা আজকের প্রযুক্তির ভাষায় নেটওয়ার্কিং.. সম্পূর্ণভাবেই আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান চর্চার অধীন।
[12/24, 3:40 PM] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

ঠিকরিয়ে বেরোচ্ছে নানান রঙ-দর্শনে সাধক কমলাকান্তের তো পাগল হবার জোগাড়,আর মহেন্দ্রনাথ স্থির হয়ে, মানে বিদেহ হয়ে করে চললেন এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা...!

কোথায় মা কালো, এতো সর্ব বর্ণের আধার,জ্যোতির্ময়ী-কমলাকান্তের ভাবচক্ষুতে।

মহেন্দ্রনাথ বললেন.. কালো রঙই,সমস্ত রঙের জননী স্বরূপা।

ওনারা দুজনেই ভারতের সুসন্তান আমাদের অভিভাবক, পথ নির্দেশক।

এই দর্শন চক্ষু কি লাভ করতে পারি আমরা?

অবশ্যই পারি, আর এর জন্য তো প্রথমে দরকার কিছু স্থূল প্রমাণ আর তারপর সেই প্রমাণ কে বিশ্বাস করে মনের জটিল প্যাঁচগুলি আস্তে আস্তে ধৈর্য সহকারে খুলতে খুলতে সরল হয়ে যাওয়া।

ব্যাস, এটুকু করলেই হবে.. মা দেখা না দিয়ে কোথায় যাবেন?

তাঁর ঐ সুপ্ত দেখা আমাদের জন্মের পূর্বেও ছিল আর পরেও থাকবে, শুধু মাজখানে একটু কষ্ট করে, মায়ের কষ্ট বুঝে আমাদের যে প্রধান ও একমাত্র অবলম্বন মা.. এটুকু ভাল করে বোঝানোর জন্যই, এই আপাত আদর্শন।

যে কাজই করি না কেন, যা কিছুই ভাবি না কেন... এসবই যে শুধুই মায়ের কাজ, মায়ের ভাব... এটা যত তাড়াতাড়ি অনুভব হবে মাতৃরূপা কালী ততই এগিয়ে এসে আমাদের কোলে টেনে নেবেন।

তাঁর কোলের ভেতরেই রয়েছি, এটা বোধে বোধ হবে।

তিনি আর শিব ডিঙ্গতে পারছেন না,কিন্তূ উল্টোদিক থেকে আমাদের তো তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়াতে বাধা নেই.. তাই আমাদের একটু পথ চলতে বলছেন-মাতৃ সন্নিধানে।

যত যাওয়া যাবে,ততই দীপাবলীর রোশনাই.. আলোয় আলোয় জ্যোতি!

কমলাকান্তের হৃদয়পদ্মে জ্যোতি।

মহেন্দ্রনাথের বুকে এসে পড়েছে জ্যোতি।

আর স্বামীজী সাহস করে এগিয়ে.. একেবারে কোলের ভেতর লাফ-নিবেদিতারও তাই.. আলোয় কালোয় মেশামেশি হয়ে একেবারে পূর্ণ চৈতন্যতে বেঁহুস।

কোথায় মৃত্যু.. নব+ যৌবন-জন্ম লাভ!

মৃত্যুরুপা,না মৃত্যদূরকারিণী?

নবজন্মের সন্ধিক্ষণ,নব প্রেরণার উদ্ভাস,অকুন্ঠ প্রেমের নির্যাস মাখিয়ে মায়ের আরাধনা.. মহাবিজ্ঞান পূজা... কালীপূজা।
[12/24, 3:40 PM] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

পরা-বিজ্ঞান আর অপরা-বিজ্ঞান..

এরকম বললে কি খুব ক্ষতি হয়?

কেন,উনি কি ব্রম্ভার বই পড়ার কথা বলেন নি..
ব্রম্ভা আবার বই লিখলেন কবে-এ প্রশ্নও তাহলে উঠতে পারে,তাই না?

পুরো সৃষ্টিটাই তো একটা বই..পাতার পর পাতা দিয়ে সাজানো আর মাঝে মাঝে ফুল নানান রকমের-এই ধরুন না,আকাশে তারাফুলগুলো,আবার ফুলের সব বাগানের সঙ্গে একটু আধটু জলাশয় না থাকলে কি আর ভালো দেখায়,তাই কিছু কিছু সাগর আর মহাসাগর।

আর আমাদেরও তো ঘুরে ফিরে একটু দেখবার জন্য জায়গা চাই-তাই এই পৃথিবীর কিছুটা স্থলভাগ,আর একটু ওঠা নামা না করতে পারলে কি আর ভালোলাগে-সেইজন্য একটা হিমালয়,একটু আলপস সঙ্গে ছোট ছোট টিলার মতন বিন্ধাচল ইত্যাদি অনেকগুলো সাথে আবার মালভূমি!

আজব সব দর্শক যাদের চোখ ফুটেছে,কি ফোটেনি... সেই এককষী প্রাণী থেকে এই মানুষের ঢল নানান পোশাকের মতন -সাদা,কালো,হলুদ চামড়ার সাজে।

এর মাঝে এইসব কীর্তি দেখে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের দল বানাতে চাইলো কৃত্রিম বাগান... জ্বালাতে লাগলো টুনি বাল্ব থেকে ছোট ছোট LED, আবার হ্যালোজেন থেকে মার্কারী বা সব মেটালিক লাইট, প্রকৃতি থেকেই হাওয়া নিয়ে ঘোরাতে শুরু করল পাখা, বাতাস কে চাপে রেখে এয়ারকন্ডিশনিং যন্ত্র, হাঁটতে না চেয়ে মোটর গাড়ি-এখন তাও চলোকবিহীন হতে চলেছে সর্বত্র, খাওয়া দেওয়া সেই ব্রম্ভার সৃষ্টি থেকেই নিয়ে এসে-নানান পদ... তালিকার শেষ নেই।

এবার সব সে তালিকা ভুক্ত করে লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করতে শুরু করল "মুদ্রিত পুস্তক"নাম দিয়ে... আমাদের পড়তে লাগলাম আর যে সব পদ্ধতি ব্যবহার করে,ঐসব যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বানানো হয়েছে বা হচ্ছে-তার নাম হল বিজ্ঞান।
এটাই আমাদের জ্ঞানের জগতের চূড়ান্ত ধরে নিয়ে পথ চলা আমাদের।

মহেন্দ্রনাথ ঐ পথিকদের কয়েকজনকে হঠাৎ ভাব-দর্শন দিয়ে বললেন আর দেখিয়েও দিলেন... ওরে আরও সব অনেকবেশি আনন্দের জায়গা আছে,সে সব জায়গায় যাওয়াও যায়.. যাবি নাকী?

মানুষের কৌতূহল খুব বেশী, তারা বলল,হ্যাঁ নিশ্চই যাবো।

তাহলে কিন্তূ কিছু বইপত্র পড়তে হবে।

কি বই?
ব্রম্ভার বই!

কোথায় পাওয়া যায় সে বই?
ছাপার অক্ষরে লেখা আছে রে,আর ওর ভেতরেই ঐ বইগুলি পড়লেই ব্রম্ভার বই পড়ার ব্যাপারটা জানতে পারা যাবে।

উল্লেখ করা নিশ্চই প্রয়োজন যে ঐ কৃত্রিম বিজ্ঞান বা অপরা-বিজ্ঞান এর চর্চার ভেতর দিয়েই আমাদের মহেন্দ্রনাথের পরা-বিজ্ঞান এর অন্দরে আমরা স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করতে পারবো।

তাই ব্রম্ভার বইগুলোর সঙ্গে একাত্ত্ববোধ করতে আমাদের মহেন্দ্র চর্চার একান্ত প্রয়োজন।

উনি যে নবতম অর্থাৎ অতি আধুনিক পরা-বিজ্ঞান এর অবতারণা করলেন,তা বর্তমান অ আগামী বিশ্বের আগমনী সংবাদ।
[12/24, 3:40 PM] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র-মহেন্দ্রনাথ...

এই বিদ্যুৎ পুরোপুরি আধ্যাত্মিক বিদ্যুৎ।

এক্ষেত্রে ওনারা সব ভাইই কার্যত এক গোত্রধারী।

কি গোত্র?
বিদ্যুৎ গোত্র!

ব্যাপারটা আসলে কি হয়?

কিছুই হয় না, শুধু এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে থাকা অল্প শক্তির বিদ্যুৎ প্রবাহগুলিকে একমুখী করে, নিজেদের ভেতর ওনারা চালনা করতে পারেন আর এর ফলে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ওয়াট আধ্যাত্মিক বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হয়।

এবার ট্রান্সমিশন আর ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক এর মতন, ঐ মারাত্মক মাত্রার শক্তিকে ওনারা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেন।

এর ফলে বিশ্বের এখানে ওখানে মানুষ নামক বাল্বগুলি জ্বলে ওঠে আর সেই স্থান আলোকিত হয়।

আসলে স্বামীজীরই বক্তব্য অনুসারে, একমুখী গতির প্রবাহকেই-ধ্যান আখ্যা দেওয়া হয়।

তাই এই ধ্যান ওনাদের জেগে, না জেগে সর্ব অবস্থাতেই স্বয়ংক্রিয় ভাবেই চলতে থাকে।

স্বামীজীর ওনাকে ইলেকট্রিসিটি পড়াবার আগ্রহ পূর্ণ মাত্রায় সফলতা লাভ করেছে, এ স্বচ্ছন্দে বলা যায়।

তিনি সমস্ত স্নায়ুর ভেতর সঞ্চিত বিদ্যুৎ কে একত্রিত করে নানান বৈদ্যুতিক-বই রচনা করলেন।

তাঁর ঐ বইগুলি আসলে বিদ্যুতের আধার মাত্র।

একটা বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র থেকে যেমন দুই প্রধান তার বা সংযোজক বেরোয়, ঠিক সেইরকম এই মহেন্দ্র-বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্র থেকে, একটি তার বা সংযোজক বেরিয়ে আমি বা আপনার সঙ্গে অদৃশ্যে যুক্ত হচ্ছে,আর অন্য তার বা সংযোজক তা বর্তনি পূর্ণ করে যুক্ত থাকছে স্বয়ং মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে, যার ফলে অক্লেসে ওনার ভাব আমাদের ভেতর প্রবেশ করতে পারছে আর ঐভাবে আমরা ভাবিত বা অবিষ্ট হয়ে পড়ছি!

আচ্ছা এই আধ্যাত্মিক বিদ্যুৎ আর তথাকথিত বিদ্যুৎ এর মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে?

অবশ্যই আছে।

এটা অনেকটা কায়া আর ছায়ার মতন ব্যাপার।

আধ্যাত্মিক বিদ্যুৎ যদি কায়া হয়, অন্যটি ওটার ছায়া।

যাঁরা এই বাহিরের বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেছিলেন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিও,তাঁদের সকলের ভেতর, এই আধ্যাত্মিক বিদ্যুৎ এর প্রবাহ নিশ্চিতভাবেই প্রবাহিত হয়েছিল।

তাঁদের সেই একাগ্রতা ও ধ্যানের প্রত্যক্ষ ফলই আমরা শুধু আজ বিশ্বজুড়ে দেখতে পাচ্ছি।

কেউ অন্তরের খোঁজ পেলে... বাহিরটাও অন্তরের ভেতরেই চলে আসে...
[12/24, 3:40 PM] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

মহেন্দ্র বিজ্ঞান চর্চা,একদিক থেকে আলোক বা পরম জ্যোতির চর্চা,কারণ এ তো পুরোপুরি আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান-এতো আলোতে মোড়া আবার বিচ্ছুরণও সর্বদা করছে জ্যোতি সমস্ত ব্রহ্মান্ড জুড়ে।

কৈ আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না...
একটু দেখার চেষ্টা করলেই,দেখতে পাওয়া যাবেই যাবে।

এই আলো আবার জগৎজোড়া দীপাবলির রোশনাই,আর নানান নকশা আর রঙে রঞ্জিত।

সমস্ত প্রযুক্তি মায় জ্বালাবার সুইচ বা চাবি গুলোও ভেতরে!

আশ্চর্য এর কারিগরি,দেখলে অবাক হতে হয়।

নানান স্নায়ুর গুচ্ছ-নানান বর্ণের আলোক বিচ্ছুরিত করছে,আবার কখনো একজাতীয় স্পন্দন মাত্রার স্নায়ুর নকশা এই জ্বলে উঠছে তো পরক্ষনেই অন্য অন্য সব স্নায়ুমন্ডলীর নানান বর্ণময় জ্যোতি-মিশ্রিত আলোর রঙের বন্যা সমস্ত পথের ভেতর-এ মাথা থেকে ঐ দূরের ওমাথায় যাচ্ছে আবার আসছে!
চোখ মানে মনের চোখ ধান্দিয়ে দিচ্ছে আর আনন্দের হিল্লোল সমস্ত সত্তা জুড়ে দর্শকদের।

এই দীপাবলী দর্শন করতে কি আমরা যেতে পারব না?

পারব না মানে,আলবাত পারব আর সেই জন্যই তো মহেন্দ্রনাথ এতো কষ্ট করে আমাদের দিব্যচন্দনেরনগরে নিয়ে গেলেন ভাব দিয়ে গড়া প্রতিমাগুলো আর জ্যোতি-আলোকসজ্জার রহস্য জানিয়ে দিতে।

এইসব প্রযুক্তির বর্ণনাই তো সব ওনার হরেক বিজ্ঞানের বইগুলি জুড়ে করা... একটু কড়া নাড়লেই-এসে দরজা খুলে দেবেন।

এই কড়া নাড়া=তাঁর বই পড়া...
[12/24, 3:40 PM] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

প্রকৃতির সঙ্গে যোগ স্থাপন=ব্রহ্মার বই পড়া..

আচ্ছা ছুটোছুটি করা অবস্থাতেও কি আসন করা চলে?
অব্যশই চলে। কারণ ঐ আসনে বসবেন কে?
আমি, আপনি.. না স্বয়ং চৈতন্য?
বসাতে হবে আদর আপ্পায়ন করে ঐ পূর্ণ চৈতন্যকেই শুধুমাত্র।

সোজা হয়ে বসা, নড়াচড়া একদম না করা প্রথম অবস্থায়, এইসব করার বিধান দেওয়া হয়।

আসলে শুন্যে শুন্য মিলাইল... এতো প্রায় শেষের কথা।

দেখুন,আত্মা বা চৈতন্য তো নড়াচড়া করে না, আর ঐ আত্মার উপস্থিতির অনুভব করার জন্যই বিভিন্ন যোগভ্যাস।

তার মানে ঐ আত্মায় তো এক অর্থে কোন স্পন্দন নেই,তাই সিদ্ধ যোগীরাও এটা প্রয়াসের মাধ্যমে অনুভবে পূর্ণভাবে সমর্থ।

এর কিন্তূ পূর্ববর্তী অবস্থাতো আছে.. সেগুলো কি?

মহেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের ভাষায় ধীরে ধীরে স্থূল স্পন্দন থেকে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম,অতি সূক্ষ্ম এবং অতীব সূক্ষ্ম স্পন্দনমাত্রার স্তরে যাওযার চমৎকার ব্যাখ্যা আমরা প্রাপ্ত হই।

এই স্তরগুলো কে একটু বিশ্লেসন করলে আমরা এই আসন রহস্য সম্মন্ধে পূর্ণ ধারণা ও জ্ঞানলাভ করতে পারি।

প্রকৃতি বলতে এক্ষেত্রে প্রথমে কিছু বিশাল ভাবের বা উদ্ভবকের সাহায্য আমরা নিতে পারি।

ক)বড় খোলা মাঠ(শ্রী শ্রী ঠাকুরের ভাবে)
খ)বিশাল আকাশ
গ)বড় জলাশয়
ঘ)বড় বনানী
ইত্যাদি
এই প্রত্যেকটি উদ্বোধকের-নিজ নিজ স্পন্দন আছে আর তাদের মাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন।
চেষ্টা করতে হবে, নিজের মনকে স্থির করে-ঐ স্পন্দনের সঙ্গে একেবারে ধীরে ধীরে মিলে যাবার।

এটা করতে পারলেই, সঙ্গে সঙ্গে নিজের এক বিশালত্ব অনুভব হবেই হবে।

এর পরবর্তী পর্যায়ে.. সোজাসুজি আত্মার সঙ্গে মিলিত হবার প্রচেষ্টা।

এটিতে সফলতা এলেই.. পূর্ণ চৈতন্য এবং অমরত্বলাভ!

এইসব নিয়েই মহেন্দ্র বিজ্ঞান ও দর্শন...
[12/24, 3:40 PM] Sanjay Ghosh: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

আবরণী বা ছটা...

এই প্রসঙ্গ মহেন্দ্র দর্শনে বারবার এসেছে।

এটা যেন মন বোঝার মাপকাঠি ওনার!

কোন অবস্থায় মন রয়েছে বা ব্যাক্তি কোন চরিত্রের, এটা ঐ আবরণীর বর্ণ দেখে বোঝা যায় এটা বলেছেন।

এই তত্ব কে ধ্রুবক ধরলে আমরা খুব সহজেই এই আবরণীর অস্তিত্ব ও গুরুত্ব সম্মন্ধে জানতে পারি।

জগতে এমন কোনো স্থূল বা সূক্ষ্ম বস্তূ নেই, যার কিনা ঐ আবরণ বা ছটা নেই।

উনি,আবরণীর সঙ্গে আবার শক্তি শব্দটাও জুড়ে দিয়েছেন।
তার মানে ছটার বর্ণ বা চরিত্র দেখে-শক্তির পরিমাপও করা সম্ভব।

শক্তি সবসময় প্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে আর তাই তা, বস্তূ বা জীবদেহের আস্তরণের কিনারায় এসে উপস্থিত হয়।
এর ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অল্প হলেও, সর্বদা ঐ শক্তি বিকিরিত হয়ে থাকে।

এটিকেই ঐ ছটা নামে, পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ অভিহিত করেছেন।

দুটি সাধারণ জামার বোতাম কে পাশাপাশি রেখে লক্ষ্য করুন একটু ভালোভাবে... দেখবেন দুটি বোতাম থেকেই, বোতাম কে ঘিরে একটি আবছা রিং এর মতন তৈরী হয়েছে আর ওদের যত কাছাকাছি আনা যাবে, ততই ওরা একজাতীয় বলে মিশে যেতে চাইবে।
ছটা দর্শন সহজেই হয়ে যাবে।

মহাপুরুষ দের ক্ষেত্রে যে মস্তক এর চারিধারে দিব্য ছটা বা জ্যোতির বলয় দেখা যায়, এটাও সমগোত্রের হলেও, চরিত্রগতভাবে একেবারেই ভিন্ন।

এটা মহাশক্তি বিকাশের চিহ্ন, যা তাঁদের ভেতর থেকে সর্বদাই নির্গত হয়।

এ বিজ্ঞান আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ আর মহেন্দ্রনাথ তাঁর রচনায়, বিজ্ঞানটির সমস্ত কারণ ব্যাখ্যা করেছেন,আমাদের সহজে বোঝার প্রয়োজনেই কেবলমাত্র।

[16:08, 24/12/2024] Bon: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

প্রথমে দেখতে হবে মাটির জগৎ নিয়ে বিজ্ঞান,না আকাশ নিয়ে বিজ্ঞান,না আরও কিছু নিয়ে বিজ্ঞান..

ঐ গ্রহটা আমাদের এই পৃথিবীর মতন অনেকটা,ঐ তারাদের আলো এতো দূর থেকে আসছে বা ওখানে জল থাকতেও পারে আবার নাও পারে। বাতাসের ক্ষেত্রেও এইরকম।

আর মাটিতে ঐ পরমাণু কেমন, ভাঙলে কি হয়, সঙ্গে সুখ, দুঃখ,আশা, নিরাশা এসব তো আছেই।

আচ্ছা,এইসব জানা গুণগুলো ছাড়া, অন্যকিছু গুণ বা গুণগুলোর অপরিচিত ব্যাখ্যা কি আমরা পাই?

মনে হয় বিশেষ পাই না, তার মানে ঐ পরিচিত জগতের ভেতরেই আমাদের ঘোরাফেরা কেবলমাত্র আর সেইহেতু আমাদের জানা বিজ্ঞান এর পরিধিও সীমাবদ্ধ।

কেউ কি বলছেন যে পরমাণু ভেঙে আবার জোড়া লাগিয়ে দিতে পারি বা ব্রহ্মভান্ডের বাইরে গেলে আরও সব নানান গুণ আছে?

কেউ না, এটাই তো বলবেন...

কিন্তূ এমন একজন আছেন, ছিলেন এবং থাকবেন... তিনি এই খবর দিয়েছেন আমাদের... তাঁর নাম শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

তাহলে এই যে নতুন সব জ্ঞান যুক্ত হবার প্রয়াস পেল.. এর পদমর্যাদা কি বিজ্ঞানের আঙিনায় হবে না?

সুখের বিষয় এটাই অদূর ভবিষ্যৎ এ ওনার বিজ্ঞানটাই শীর্ষস্থানে থাকবে আর বাকি সব নিচে।

এর কারণ উনি মহাবিজ্ঞানী শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কে নিজে শীর্ষ স্থান অন্তরে প্রদান করে ওনার সঙ্গে মিশে গিয়ে শ্রী শ্রী ঠাকুরের গুণাবলিগুলিই বিশ্লেসন করেছেন।

এটিই আগামীর মহা বিজ্ঞান আর এর পরিধি নেই... অনন্তময়!

ব্যাখ্যাকার মহেন্দ্রনাথ তাঁর রচনাবলিতে এই আধুনিকতম শান্তিময়, জ্ঞানময় বিজ্ঞানটির যথার্থতা পর্বে পর্বে প্রমাণ করেছেন।

[16:08, 24/12/2024] Bon: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

জানা+অজানা=মহেন্দ্রনাথ..

আমরা যা কিছু এই গুণের জগতে জানি,তাতো বটেই,এমনকি যা জানিনা-সে সমস্ত রহস্যও উনি ভেদ করে আমাদের ইঙ্গিতে এবং ব্যাখ্যায়,উনি পূর্ণ করে দিয়ে গেছেন।

না জানা-গুণ গুলি সত্যিই কেমন,তা দর্শন করতে উনি আমাদের প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

কোন ক্ষেত্রে নয়..?

জন্মাবার রহস্য থেকে দেহত্যাগ,মায় তার সমস্ত পরবর্তী অবস্থাও।
মিলনে একটি ফ্ল্যাশ হয়,তবেই সন্তানসম্ভবা কেউ হন.. প্রত্যক্ষ প্রমাণ-চিরঞ্জিব বলিয়ার মহাশয়, ওনার এক প্রাচীন অনুরাগী।

যত রঙ আমরা দেখি,তার বাইরেও অজস্র জ্যোতিমিশ্রিত রঙ রয়েছে,যা কিনা সাধনার উচ্চস্তরে দর্শন হয়।

আলোক এর ক্ষেত্রেও,ওনার মত অনুসারে অগুনতি বিভাগ সাধারণ স্নিগ্ধ থেকে প্রখর শুধু নয়, মায় স্নিগধের স্নিগ্দ্ধ আলোক থেকে অতি উজ্জ্বল জ্যোতি ও তার বিকিরণের প্রমাণ-মহেন্দ্র বিজ্ঞান।

তাপ এর ক্ষেত্রেও.. আধার অনুসারে অর্থাৎ আধারের মনবৃত্তি অনুসারে তাপের অনুভব এর রহস্য-উনি উদ্ঘাটিতো করেছেন

স্নায়ু বিদ্যুৎ থেকে,ভূপৃষ্ঠের বিদ্যুৎ এর সংবাদ দিয়েছেন।

ধাতুবিদ্যার ক্ষেত্রে রূপান্তরিতকরণের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন,গতি,গতিচিত্র ও স্পন্দন এর পট ভূমিকায়।

পৃথিবী গঠন রহস্যর বাহ্যিক কুণ্ডলাকৃতি চিহ্ন উনি উদাহরণ সহযোগে প্রমাণ করেছেন।

সর্বোপরি মানব-মনের গঠন ও সমস্ত ক্রিয়া উনি পূর্ণভাবে বর্ণনা করে আধ্যাত্মিকতার বিজ্ঞানটিকে আমাদের সকলের সামনে এনে উপস্থিত করে ভবিষ্যৎ এর গবেষণা,শক্তি সঞ্চয় ও প্রগতির সকল পথ সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে গেছেন।
[16:08, 24/12/2024] Bon: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

মহাজাগতিক মহেন্দ্রনাথ..

ছোটবেলায় পড়া ছিলো-নব গ্রহ,আপনারা এই পড়া কেউ কেউ পড়ে থাকতে পারেন।

শাস্ত্রে বলে উপলব্ধির নয়টি প্রধান দ্বার আছে।

আবার শাস্ত্র বলছেন,যা রয়েছে এই মনুষ্য নামক যন্ত্রে,ঠিক তাই রয়েছে মহাবিশ্বে।

এর চেয়ে বৈপ্লবিক উক্তি আর গবেষণার উচ্চ ফল হয় না।

সাধক মাত্রেই এই উক্তির যথার্থতা অন্তরে সর্বক্ষণ জাগ্রত রাখেন।

তাই ঠিক ঠিক নিজেকে জানতে পারলেই, জগৎ কে নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব হয়।

নিজের ভেতরের ঐ নয়টি দ্বারের সব রহস্য যিনি জানেন, ইচ্ছমাত্রই যে কোনো দ্বার দিয়ে আশা যাওয়া করতে পারেন, তিনি ঐ নব গ্রহতে অক্লেসে ভ্রমণ করে থাকেন।

মহেন্দ্রনাথ সর্বদাই একযোগে ঐ সবকটি দ্বার দিয়েই চলাফেরা করতে পারতেন আর তাই অত্যন্ত সাবলীলভাবেই পূজনীয় শিবদাস বাবুকে বললেন,মঙ্গলে বেরিয়ে এলুম। মনে হয়, এই পৃথিবী ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব আর কোথাও নেই।

এর কারণ মানুষ নামক সর্বৎকৃষ্ট জীবই একমাত্র প্রাণের ধারণা প্রথমত করতে সক্ষম আর যা কিছু সে দেখে ও বোঝে, তাতেই ঐ প্রাণের পরশ থেকেই যায়।

সে প্রাণ দিলে, তবেই অন্য কিছু প্রাণপূর্ণ হয়। না দিলে কখনোই হয় না।

যেহেতু এই মানুষই ঐ নব গ্রহতে যেতে পারে নিজের ভেতরে একাগ্রতা সাধনের মাধ্যমে, তাই সর্বত্র প্রাণ সঞ্চার ও ক্রিয়া, সেই করে থাকে।

সাধারণ অবস্থায় যেমন মূলাধারের দ্বার বন্ধ থাকে, কিন্তু ক্রিয়ার ফলে জাগ্রত তথা মুক্ত করা যায়, এই নব দ্বারও ঠিক সেইরকম।

প্রাণের গতিলাভ হয় সুসুমনা বেয়ে সহস্রার অভিমুখে। আর সহস্রারের দ্বার দিয়েও অনায়াসে যোগী মুক্ত আকাশে পরিভ্রমণ করতে পারেন।

নব দ্বার দিয়েও,তিনি প্রয়োজনে ও কৌতূকে মুক্তাকাশে বিচরণে সক্ষম।

এটিই মহাজাগতিক রহস্যর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা, যা ভারতীয় ঋষিরা বহু যুগ আগে উপলব্ধি করে প্রচার করে গেছেন।

এ তত্ব রোজ রোজ পরিবর্তিত হয় না।

পূণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথ তাই এক মহান মহাজাগতিক ঋষি।
[16:08, 24/12/2024] Bon: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

বৈদ্যুতিক মহেন্দ্রনাথ..

উনি বিদ্যুৎময় ব্যক্তিত্ব।
কমবেশি সব সাধক সাধিকা বা অন্য যে কোনো পেশার অসাধারণ(যথার্থ)
ব্যাক্তিত্বই যদিও বিদ্যুৎ সঞ্চয়াগারে কিছুটা পরিবর্তিত হন,কিন্তু যুগ -জাগরণকারী মহাপুরুষ ও মহানারীরা সর্বদা অসংখ্য ভাবে বিদ্যুৎময় হয়ে থাকেন।
এ তাঁদের কথাবার্তা থেকে শোয়া এমনকি নিদ্রার ভেতরও ক্রিয়া করে।

যা তাঁরা কাউকে প্রদানও করেন,তা সে যেকোনো আবরণের ভেতর দিয়েই হোক না কেন... তা বিদ্যুৎ ব্যাতিত আর কিছুই নয়।

দীক্ষা থেকে শুরু করে প্রসাদ প্রদান,এমনকি কথোপকথন এর ভেতরও এই বিদ্যুৎ পূর্ণমাত্রায় প্রবাহিত হতে থাকে।

প্রশ্ন আসবে কৈ আমরা তো বিদ্যুৎপ্রিষ্ট হয়ে পড়েছি এমন তো কখনো মনে হয় নি।

ঠিক কথা।
কিন্তু আপনার মনবৃত্তির যদি পরিবর্তন হয়,কিংবা দৃষ্টিভঙ্গীর-তাহলে নিশ্চিত বুঝবেন যে বিদ্যুৎ-সর্প আপনাকে দংশন করেছেই করেছে।
দেখুন কুন্ডলিনী শক্তির প্রবাহ কে সর্পর আকারে দেখানো হয়,আধ্যাত্মিক জগতে অনেক চিত্র-চিহ্ন তে সর্প এমন কি কোনো প্রতিষ্ঠানের লোগো তেও!
কেন?

ওটি ঐ বিদ্যুৎ প্রবাহের বার্তাই আমাদের দেয় বলেই।

বিদ্যুৎ কার্যত একপ্রকারের মোটেই নয়-সাধারণ এই বিজ্ঞান এর জগতেই স্থির থেকে চলমান আবার তারও রকমফের রয়েছে এসি,ডিসি ইত্যাদি,এ ছাড়াও গালভানিক বিদ্যুৎ,স্নায়ু-বিদ্যুৎ রয়েছে।

আর একাগ্রতার বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ভাবের জাগ্রতিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্তর জগতে যে নানান চলাচন যেন কীসের... ব্যাক্তিমাত্রই অনুভব করে থাকেন-তা অন্তর বিদ্যুৎ ছাড়া আর কিছুই নয় আর এরও রকমফের আছে।

এই বিদ্যুৎ কে ব্যাক্তি প্রথমে নিয়ন্ত্রণ ঠিকভাবে না করতে পারলেও,উত্তরকালে সিদ্ধ হন।

তাই অসংখ্য ভাব দর্শন ও প্রদানকারী মহেন্দ্রনাথ যে ছিলেন,তা তাঁর অসামান্য কর্মের ভেতর দিয়েই প্রমাণিত হয়।
[16:08, 24/12/2024] Bon: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

কোনো জিনিস কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্ল করবিনা,প্রণম্য ধুলোটা পর্যন্ত।
জানবি ওর ভেতর একটা গোটা পাহাড় লুকিয়ে রয়েছে।

কি অপূর্ব শিক্ষা দেবার প্রণালী।
পারমাণবিক বিষয়ের শিক্ষাদান এটি, এতোই সহজ করে।

ধুলোর একটি কণা নিয়ে বিশ্লেসন করতে করতে, নিজের আমিটা আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হতে শুরু করে আর সেই জায়গায় ধুলোর ঐ কণার ভেতর থেকে নানান জ্যোতির্ময় রশ্মি বিচ্ছুরিত হতে শুরু করে আর আমাদের সঙ্গে এক বার্তা বিনিময়ের মাধ্যম তৈরী করে।

হ্যাঁ, শুধুমাত্র একাগ্রতার যন্ত্র সম্বল করেই, এই পর্যবেক্ষণ চালানো সম্ভব।
কোনও ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ ইত্যাদির দরকার নেই।

একেবারে খাঁটি কথা শুনতে পাওয়া যাবে

মনকে আরও সংযুক্ত করলে... হঠাৎ সব যেন কালো বর্ণের হয়ে গেল, কিন্তূ এই কালোও যেন একটু অন্যেরকমের -কালোর সঙ্গে আলো মেশানো এক বর্ণ!

কৈ আমি কোথায় গেল?
তার মানে এই -আমি কি বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছিল?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

তাহলে তখন ঐ ধূলি কণাটা কোথায় ছিল?

ঐ তো দেখালো ওর ভেতরটাকে।

ওর ভেতরটা এরকম অসীম কালো বর্ণের!

হ্যাঁ।
তার মানে মহেন্দ্রনাথ যে বলছেন Atoms হল suppositional.. আসলে রূপ গঠনে মানে স্থূল ও সূক্ষ্ম সব রূপ গঠনের জন্য.. ওদের আমরা মানসিকভাবে গঠন করেছি?
অবশ্যই।
চিন্তাতেও কি তাহলে পরমাণু উপস্থিত।
চিন্তা মানেই তো বিন্দু বিন্দু করে পরমাণুর রেখা সজানো মাত্র।

আরও পড়ে রূপের বা অজস্র পরমাণুর স্তূপ হয়ে... পাহাড়ের সৃষ্টি!
[16:08, 24/12/2024] Bon: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

যাও, গিয়ে ভাবগে যাও। এ কথা অনেককেই বলতেন।

কি নিয়ে ভাবা হবে, না একটা কোন অবশ্যই বিষয় নিয়ে।

ভাবতে হবে কেন?
যেহেতু মনে কিছু প্রশ্ন এসেছে সেইজন্য।
ভাবলেই কি তাহলে সমাধান পাওয়া যাবে?
কিছু তো অন্তত যাবেই, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভাবনায় কি হয়?
ক) স্পন্দন স্থূল বা মন্থর অবস্থা থেকে সূক্ষ্ম বা দ্রুত হয়।

খ) ক্রমশ দেহ ও মন স্থির এবং শান্ত হতে থাকে।

কেন এরূপ হয়?

অসংখ্য স্থূল ও সূক্ষ্ম স্নায়ুর ভেতর শক্তি চলাচলের জন্য।

তাহলে চিন্তা বা বিশেষরূপে ভাবনা কে কি একটা পদ্ধতি হিসেবে ধরা যায়?
অতি অবশ্যই যায়।

শ্রী শ্রী ঠাকুর যে বলতেন,ঈশ্বরের চিন্তার কথা,এর সঙ্গে এই চিন্তার কি কোনো সম্পর্ক আছে?
নিশ্চয়ই আছে।

যে কোনো ক্ষেত্রে,মানে ক্ষেত্র যদি প্রস্তুত হয় তাহলে যথার্থ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা সে খেলা থেকে শুরু করে চাষবাস,এমনকি অধ্যয়ন সবকিছুই।

এই ক্ষেত্র প্রস্তুতের সঙ্গে কি প্রযত্ন এবং শুদ্ধিকরণের সংযোগ থাকছে?
নিশ্চিত থাকে।
তাহলে মহেন্দ্র ভাবনার সূত্র ধরেও কি এই শুদ্ধিকরণ হওয়া সম্ভব আর সেটি আদপে কোন চরিত্রের?
অবশ্যই সম্ভব আর এই শুদ্ধিকরণ আর সূক্ষ্ম স্নায়ু উন্মোচন... একই অর্থ বহন করে।
যত সূক্ষ্ম স্নায়ু উন্মোচিত হতে থাকবে, ততই বড় ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকবে।

এই ক্ষেত্র প্রস্তুত হলেই... প্রশ্নই উত্তর নিয়ে ফিরে আসবে।
পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ এই আশাটাই শুধু সকলের কাছে রাখতেন।

এটাই তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষাপ্রদান পদ্ধতি।

এটি এক পুরোপুরি সময় সংক্ষিপ্ত করার অতি কার্যকরী বিজ্ঞান ও সকলের জন্য সমানভাবে ফল প্রদানে সক্ষম।
[16:08, 24/12/2024] Bon: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

আদিতে সকলেই জানেন যে, আজকের এই বিজ্ঞান-প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নামক একটি বিষয়ের অন্তরভূক্ত ছিল।
আজকে এই বিজ্ঞানের প্রচার, প্রসার ও প্রয়োগের ফলে সর্বস্তরে... বহু বহু শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়েই চলেছে।

মহেন্দ্র ভাবধারা অনুসারে এই প্রত্যেকটি শাখা ও প্রশাখাই যত মত-ততো পথের মতন একসময়ে সেগুলির মূল উৎসের দিকে ধাবিত হবে।

এটা কালের নিয়ম তথা গতি মেনেই হবে।
যেহেতু এই বিজ্ঞানের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই ঐ উৎসমুখে শাখা প্রশাখাগুলোর গমনে.. সমস্ত মানুষ তার টানে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সেই পথে চলতে বাধ্য হবে।

মহেন্দ্রনাথ যেমন পরিষ্কার বলছেন এবং আধুনিক প্রচলিত বিজ্ঞানেরও যে সুর, অর্থাৎ শক্তি তার কেন্দ্রে ফিরে আসে।

এক্ষেত্রেও তাই অনুরূপ ঘটনা ঘটার পরে কি হয়, কেন হয়, অন্তরবর্তীকালীন অবস্থায় কি হয়... এ সমস্ত উনি বিশেষরূপে বর্ণনা করেছেন আর আশ্চর্যের বিষয় হল... আক্ষরিক অর্থে এটিই মহেন্দ্র বিজ্ঞান।

এই বিজ্ঞান এর বিভিন্ন পর্যায়ে যা দর্শনলাভ হয়, সেটিই তাঁর বিজ্ঞানের দর্শন।

এক কথায় বলতে গেলে.. মানুষের প্রগতিতে-তার দেহের পরিবর্তন বিশেষ নিশ্চয়ই হয় না, যেটা হয়-সেটা প্রধানত তার মনের।

অতএব এই সূত্র প্রয়োগে.. তার ঐ উৎস অভিমুখে ফেরাও-তার মনের পরিবর্তন বা মনবৃত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে বাধ্য।

তাই এ কথা বলা কি সমীচীন নয় যে, মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শনে...আমাদের মনের কথা-এক বিশাল স্থান অধিকার করে আছে...
[16:08, 24/12/2024] Bon: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

মনের ওষুধ মনে...

ওনার বিজ্ঞান ঠিক ঠিক ভাবে দেখলে.. এক যুগবিবর্তনমুখী মহান মনের বিজ্ঞান।
এর ভেতর কি নেই :
ক) উন্নতির সোপান বলতে ঠিক কি বোঝায়।
খ) আমাদের মনের বিভিন্ন স্তরের চরিত্র চিত্রণ

গ) আরোহনের পদ্ধতি
ঘ) মনের বিস্তৃত বিজ্ঞান
ঙ) বিপরীত ভাব বা মন কে জয় করার প্রণালী
চ) মন দিয়ে মনকে সারিয়ে তোলা ইত্যাদি

অতএব বাইরে যত কিছু চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞানের বস্তুই দেখি না কেন, মহেন্দ্র বিজ্ঞান রহস্য অবগত হলে.. ওসব কোনো দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলতে পারবে না.. ফলে আমাদের যথার্থ উন্নতিও ব্যাহত হবে না।

আমরা কিন্তূ তার মানে ব্যাবহারিক দিকে অজ্ঞ থাকবো, তা কিন্তূ মোটেই নয়।
মূল কে জেনে নিয়ে আমরা ভুলগুলি দূর করতে সক্ষম হব।

তিনি তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ, সমস্ত প্রকার বল... এ সবকেই একটি মাত্র তত্বর ভেতর এনে ফেলেছেন এবং পদে পদে প্রমাণ সন্নিবেশিত করেছেন।

এটিই তাঁর মহান একিভূত তত্ব... মহেন্দ্র-স্নায়ু-তত্ব।

আলবার্ট আইনস্টাইন যে জীবনের শেষ প্রায় ৩০ বছর ব্যায় করেছিলেন শুধু একটি তাত্বিক ব্যাখ্যা করতে.. জগতে প্রচলিত বা আবিষ্কৃত বিভিন্ন বলগুলিকে.. একটি তত্বের আয়তাভুক্ত করতে যার নাম, আপনারা সবাই জানেই.. Unified Field Theory.

কিন্তূ মহেন্দ্রনাথ যে বিস্ময়কর কর্মটি করলেন তাতে কি নেই?
১) সমস্ত বল
২) ৪০ ধরণের শক্তি ও অবশ্যই সেগুলির চরিত্র
৩) অদৃশ্য জগতের ৪০ ক্ষেত্রগুলি
৪) প্রয়োগ ও উপলব্ধির উপায়
৫) অভর্থ্য শান্তি ও শক্তি লাভের বিধান।

একটি নতুন যুগের প্রয়োজন কি এর চেয়ে বেশী কিছু থাকে?
[16:08, 24/12/2024] Bon: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

গ্রহদের পারস্পরিক দূরত্ব=আমাদের আমাদের অস্তিত্ব...

শোনা যাচ্ছে তথাকথিত জগৎখ্যাত প্রতিষ্ঠান বলছে... এবার থেকে ২৪ ঘন্টায় একদিন আর হবে না, ওটা হয়ে যাবে ২৫ ঘন্টায় একদিন!
কারণ নাকী এই সৌরমন্ডলের গ্রগগুলোর পারস্পরিক দূরত্বর ব্যাবধান।
তার মানে ওদের কাছাকাছি আসা আর দূরে সরে যাবার ওপর ভিত্তি করেই-এই অসামান্য গবেষণা ও তার উচ্চরবে ফল প্রকাশ।

খুব ভালো কথা, কিন্তূ আমাদের যে ভুলে যাওয়া ব্রহ্মার একদিনের বিবরণ আবার স্বামীজীর-যোগী এক জীবনেই সমস্ত জীবন পার হয়ে যান... এসবের কি কোনো সম্পর্ক আছে?

মনে হয় নিশ্চয়ই আছে আর এবার আমরা যদি একটু নিজেদের মুখের দিকে চাই মানে আমাদের অসাধারণ সব বহু পূর্বে আবিষ্কৃত তত্ত্বের দিকে, তাহলে আসল রহস্য খুব সহজেই ভেদ হয়ে যায়।

সবাই বলছে ঐ টাইম আর স্পেস এর কথা-এই ভাঙিয়ে তো এতদিন চললো,এবার নতুন সংযোজন এলো দূরত্ব।

এই দূরত্ব আসলে কি, কোথায় এর আসল অবস্থান এটা জেনে নিলে মনে হয় মহেন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আরও অনেক বেশী বেড়ে যাবে শুধু তাই নয়... আমরা তাঁর অনেক কাছাকাছি চলে আসতে পারব।

এই ক্ষেত্রে সেই আবার ওনারি স্বরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় আর দেখতে পাচ্ছি না।

তাই সেই ওনার স্নায়ুতত্ত্বের স্বরণাপন্ন হতেই হচ্ছে।

তাহলে, আসল কথাটা না হয় আজ আগেই বলে নিই।

যত দূরত্ব সব মনে=স্নায়ুতে=শক্তির তারতম্যে=বিভিন্ন আধারের বিভিন্ন অবস্থান এর ভিত্তিতে।

যত দ্রুত, যত বেশী স্নায়ুর ভেতর শক্তি প্রবাহিত হবে... ততই দূরত্ব কমতে থাকবে।

কার সঙ্গে কার দূরত্ব কমবে?
দূরত্ব মানেই,দুটো বস্তূ আছে,এটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না, তাই ভাব অনুসারে ঐ দুটি বস্তূ একজাতীয় বা ভিন্ন জাতীয় যাই হোক না কেন... একই ব্যাপার ঘটবে।

আরও একটি বিশদভাবে বললে একেবারে সোজাসুজি... সব স্নায়ু যাঁর উন্মুক্ত.. তাঁর কাছে ঐ দূরত্ব শব্দটাই পুরোপুরি অর্থহীন!
যেমন মহেন্দ্রনাথ।

আর এটাই তাঁর বিজ্ঞান।

এর চেয়ে আধুনিক ব্যাখ্যা আর কোথাও আছে কি?

বারবার জন্মগ্রহণ শুধুমাত্র=বহু বহু স্নায়ু উন্মোচনের প্রচেষ্টা মাত্র।

যখন পূর্ণ চৈতন্যতে অবস্থান... তখন সব জন্ম ও মৃত্যু জয়!

[16:08, 24/12/2024] Bon: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

মহেন্দ্রনাথ এই তথাকথিত বিজ্ঞান এর ওপর শিশু-ছাপ মেরে দিয়ে গেছেন।
বলেছেন ইউরোপিয়ানরা বহু প্রাচীন(আজগুবি) ধারণা পোষণ করেন,যা এই বিজ্ঞানের ভেতরে রাজত্ব করছে।
এগুলো সংশোধন করার কোনো প্রয়োজন নেই,শুধু আমরা কি জানি.. সেটা হবে বিশ্বজুড়ে জানাতে।

বিচ্ছিন্ন চিন্তা=বিচ্ছিন্ন কণার দল=আজকের কোয়ানটাম থিওরি।

ওগুলো নাকী শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়-কিন্তূ প্রশ্ন হল,কার বা কাদের কাছে?
যাদের মন উচ্চ স্তরে ওঠেনি-তাদের কাছে।
ঈশ্বরের বা এই সৃষ্টির প্রত্যেকটি ব্যাপার শৃঙ্খলাবদ্ধ।

আপেক্ষিকতা সম্মন্ধে বলেছেন,আমার হল কন্টিনিউটি তত্ব।

তার মানে এই আধুনিক বিজ্ঞানের যে দুটো প্রধান স্তম্ভ,সেই দুটিকেই উনি ভাবে ভেঙে রেখে দিয়ে গেছেন।
ক্রমে জগৎ বুঝতে বাধ্য।
এই হলেন মহেন্দ্রনাথ ও তাঁর মহান বিজ্ঞান!

একাগ্রতা ও শক্তি প্রয়োগের অভাব ও অক্ষমতা,অতএব একটা যা খুশি বলে দিলেই হল আর সেটাই হয়ে গেল এক যুগান্তকারী থিওরি।
সবচেয়ে লজ্জা ও দুঃখের ব্যাপার আমরা ওগুলিই প্রাণভরে পান করে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছি।

এবার তো অন্তত সময় এসেচের শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ অনুধ্যান আবার পড়ার ও বোঝার,তাই না..

কি পাচ্ছি আমরা ঐ অসাধারণ বইয়ের ভেতর?
ব্রম্ভান্ড কে... জপের মালার মতন সূত্রে সূত্রে গাঁথা অবস্থায়।
ওটাই এই যুগের জপের মন্ত্র ও মালা উভয়ই।

দেখা যাবে-আমূল পরিবর্তিত হতে বাধ্য আমাদের সমস্ত বস্তাপচা চিন্তা ভাবনা আর সেই জায়গা থেকেই উদয় হবেন যুগ সূর্য-স্বয়ং শ্রী শ্রী ঠাকুর,এই যুগের কান্ডারি।

মহেন্দ্রনাথ কে দেখা যাবে গর্ভ-মন্দিরের দ্বারে হাস্যমুখে আমাদের আওহানের রূপে দন্ডায়মান অবস্থায়।
[16:08, 24/12/2024] Bon: মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

উনি সবকিছু Angular Vision এ দেখার কথা বলেছেন আর সাথে বিদেহ হবার কথা বলেছেন।

এগুলি আসলে সবই মনকে উচ্চ পথে চালিত করার কৌশল মাত্র।

মজার ব্যাপার এই,মনের রহস্য না-জানা বিজ্ঞান আর মনের রহস্য জানা বিজ্ঞান-এ দুটোর ভেতর কোনটা বেশী কার্যকরী ও সঠিক?
অবশ্যই দ্বিতীয়টা।

মহেন্দ্রনাথ এই দ্বিতীয়টার যাবতীয় তত্ত্ব আমাদের দিয়ে গেছেন আর আমাদের শুধু প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন তাতে যে আমাদের অশেষ কল্যান হবে,এ বলাই বাহুল্য।

আসলে দৃষ্টি এখন এই অবস্থা বা পরিবেশ দেখছে ঠিক আছে।
আমরা একে বাঁকা চোরা কোনো আখ্যাই দিচ্ছি না।
কিন্তু যখনই আমরা পিছনের ছবি বা পরিবেশ দেখার এমনকি ভাবার চেষ্টা করবো,তখন মনের স্তরের পরিবর্তন হবে,পরিবর্তন হবে মনের স্পন্দনমাত্রার আর বাহ্যিকভাবে হলেও দৃষ্টির পরিবর্তনও ঘটতে বাধ্য।

এই দৃষ্টির পরিবর্তনকেই উনি angular vision বলেছেন।

আসলে এইভাবে যত পিছন দিকে চলবেন ততই ঐ দৃষ্টি একযোগে অর্থাৎ সমান্তরাল ভাবেই পরিবর্তিত হতে থাকবে,এদিকে দেহবোধ ও কমতে থাকবে।
একসময় মনেই হবে,আপনার বসবাস.. বিদেহ!

শক্তি বা দর্শন কখনো সোজাপথে হয় না,কারণ স্নায়ুগুলোও তাহলে সব সোজা সোজা হত।
হয় পেঁচানো পথে,তাই কুন্ডলী।
পুরোটা নিয়ে কুন্ডলিনী।
এটা ভেতর নিহিত বা সঞ্চিত রয়েছে অসীম শক্তি।

এবার ভাবুন তো আপনি কি ঘোরানো এক অদৃশ্য সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলেছেন।

পৃথিবী ঘুরছে তো সবাই বলছি,এক্ষেত্রে কি আপনিও ঘুরতে শুরু করেছেন.. না মাথা ঘোরার কোনো ব্যাপার নয়।

এমন একসময় হয়তো এসে উপস্থিত হল.. সব ঘোরা বন্ধ আর আপনিও আনন্দসাগরে নিমগ্ন!

তাহলে ঘোরে কে আসলে-আপনি না এই পরিচিত পৃথিবী.... মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

মাটির বিজ্ঞান,জলের বিজ্ঞান,আকাশের বিজ্ঞান.. এইসবের সার মহেন্দ্রবিজ্ঞান।

কারণ বিজ্ঞান এর পরীক্ষা নিরীক্ষায় কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় আর এই ক্ষেত্রে গোটা একটি মনুষ্য দেহধারী কে যন্ত্র হিসেবে উনি উপস্থিত করলেন,তাঁর বিজ্ঞান ব্যাখানে ও প্রমাণে!

এর চেয়ে আর আশ্চর্যের ব্যাপার কি হতে পারে?

উনি বললেন, আগামীর শুধু বিজ্ঞান নয়, দর্শন এবং ধর্মের কেন্দ্র স্বরূপই অবস্থান করবেন ঐ মানুষটি।

তার মানে সকল সমাধান রয়েছে ঐ যন্ত্রের ভেতর?

হ্যাঁ, ঠিক তাই শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ-যন্ত্র তে ব্রহ্ম ও শক্তির তাবৎ ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যাচ্ছে ভুরি ভুরি প্রমাণ সহ।

আমরা যদি কোনো বিষয়ের চর্চা করি তাহলেও কি ঐ যন্ত্র আমাদের কিছু সাহায্য করতে পারে? নিশ্চিতভাবে পারে।

আমাদের গতি,প্রকৃতি, স্থিতি ইত্যাদির ব্যাপারে?
উত্তর ঐ একই।

তার মানে কি এই দাঁড়ালো যে ঐ'এক' কি তাহলে ওনার তত্ব বা স্বরূপ?

ঠিক তাই, বহুতে রূপান্তর, মানে জল, বায়ু, আকাশ মায় সমগ্র মন-এসবই ঐ একের অধীন।

এটিকে কি ব্রহ্মতত্ব বলা হবে না শক্তিতত্ব বলা হবে?
দুটোই বলা হবে, কারণ কার্যত কোনো প্রভেদ নেই।

তাঁর মানে এই যুগে, সব বিষয়ের অনুসন্ধান ও অনুভূতির শেষে তাঁকেই লাভ বা স্পর্শ করে যাবে, এমনকি সব বিজ্ঞান চর্চার শেষেও।

হ্যাঁ,
মহেন্দ্রনাথ কি তাই,তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকার কথা বলেছেন আর আমাদের স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁকে না ভোলার কথা।

অবশ্যই।

এটা কেন এরকম হল।

কারণ, সৃষ্টি হল, কিন্তূ তার কোনো উৎস ছিল না-এরকম কি হতে পারে?

মোটেই নয়।
তাই ঐ সৃষ্টি বলে যা কিছু দেখছি,সে সব তাঁর থেকেই উৎসারিত!

একি হতে পারে?

সেই প্রমাণ পাবার জন্যই তো মহেন্দ্র চর্চা প্রয়োজন।

ওনার ছবি তোলার জন্য(সমাধিস্ত অবস্থায়),যেই ফটোগ্রাফার ওনাকে একটু সোজা করতে গেলেন, অমনি উনি পালকের মতন হাওয়ায় যেন উঠে গেলেন!
সঙ্গে সঙ্গে ফটোগ্রাফাররের দৌড়।

স্বামীজী(নরেন্দ্রনাথ) আবার ধরে করে নিয়ে এসে ছবি তোলালেন।

যখন প্রিন্ট করে ওনাকে দেখানো হল.. উনি শুধু বললেন,কালে এই ছবি ঘরে ঘরে পূজা হবে।

তাহলে ওনার প্রমাণ উনি নিজেই সিদ্ধ করলেন।

এটাই আগামীর সমস্ত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত।

পরীক্ষা হল :জপ,ধ্যান,চিন্তন,যোগ ইত্যাদি

পর্যবেক্ষণ: ঐসব পরীক্ষা করে যা যা অনুভূতি লাভ হচ্ছে সেইসব ব্যাপার গুলি।

এটাই শ্রী মহেন্দ্রনাথ বর্ণিত শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ অনুধ্যান।
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

এই পর্যায়ের আলোচনা ওনার Formation of the Earth বইটিকে কেন্দ্র করে,যে বই উনি ওনার স্নেহধন্যা টুনি বা যুথিকা রানী বসুকে(অমরনাথদার পূজনীয়া মাতৃদেবী)কে উৎসর্গ করেছেন।

অসাধারণ একটি ভূমিকা সংযোজিত করেছেন পূজনীয় বিমল কুমার বোস-ঘনিষ্ঠ মহেন্দ্র অনুরাগী।

না,দু দশ হাজার বছর নয়,কমপক্ষে ১০ মিলিয়ন বছর,যা একটি কল্প হিসেবে ভারতে জ্ঞাত,সেটির ফলশ্রুতি এই গ্লোব বা earth।
মহেন্দ্র ভাব বলছে,এই পৃথিবী গঠন এখনো সমানভাবেই চলছে,যার বিস্তৃতির সীমা নেই -জন্মলগ্ন থেকেই।

অদ্ভুত কথা তাই না?
কিন্তূ চিন্তন ও পর্যবেক্ষণে মোটেই অদ্ভুত কিছু নয়,আমরা বহু পিছনে পরে থাকাতে অদ্ভুত শোনাচ্ছে মাত্র।

গাছপালা,জীবজন্তু,পাথর ও ধাতু সবই সেই এক শক্তির মাধ্যমে গঠিত আর যে শক্তির কোন সীমাও নেই।

এখানে মহেন্দ্রনাথ ঐ শক্তির সঙ্গে প্রাণ শব্দটিকে জুড়ে দিয়েছেন,তাহলে ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়ালো- প্রাণ+শক্তি =প্রাণশক্তি।

ওনার মতে সমস্ত শক্তিই প্রাণে পরিপূর্ণ(life in energy-যা কিনা আমাদের সামনে এবং আমাদের অর্ধসত্য বোধে উপলব্ধি করতে অক্ষম।

এই অবস্থার উন্নতিসাধন করতে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেসন করে বোঝার প্রয়োজনেই, ওনার প্রয়াস এই পুস্তক রচনার।

উনি active state of energy অবস্থাটির স্বরূপ দর্শন করিয়েছেন,যা কিনা আমাদের পূর্ণমন জগতের, এক খণ্ডিত পর্যবেক্ষণের অবস্থা মাত্র।

মনের গতিকে বা আমাদের উপলব্ধি, বোধ ও দর্শন প্রণালীর যদি অল্প উন্নতিও করা যায় তাহলে.... ঐ গাছপালা থেকে শুরু করে আমাদের এমনকি নিজেদের চরিত্র বদলাতে শুরু করবে আর একেবারে শেষে কোনো গুনাগুণই খুঁজে পাওয়া যাবে না!

এই দুই extreme অবস্থার ভেতরে আরও একটা প্রধান অবস্থার কথা উনি বলেছেন, যেটা হল শক্তির সাম্য অবস্থা বা State of Equilibrium যেখানে শক্তি একটি বৃত্ত পূর্ণ করে আর স্থূল আন্দোলন স্থিমিত হয়।

স্থিমিত শব্দটা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই, পূর্বে যে আন্দোলন চলছিল,তা বোঝাই যাচ্ছে।
কে চালাচ্ছিলো ঐ আন্দোলন?
কণারা!
এটিকেই agitated state of mind বলেছেন আর এখানেই আগমন কণা বা atom দের, যাদের বাস্তব অস্তিত্ব বলে কিছুই নেই(supositional)।

আমাদের কাজকারবার সমস্ত যেহেতু এই স্থূল জগৎ বা স্থূল মনের গণ্ডীর মধ্যে,তাই এইসব কে আমরা ধ্রুবক ধরে চলি।

তাঁর point of polarisation যা স্বামীজির উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর এক হওয়ার কথা আমাদের মনে করায়... মহেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ওটা আমরা মনের ভরকেন্দ্র বলতে পারি, যার একদিকে এই স্থূল জগৎ, অর্থাৎ, ঐ অবস্থার নিচে আর অন্যদিকে পূর্ণ চৈতন্যর পথে যাত্রা বা মনের আরও উচ্চস্তরের দিকে,যেটিকে স্বামীজী আমাদের যথার্থ ধর্মজীবন শুরু হবার point বলেছেন*কার্যত দুটোই এক।

ঐ কন্ডিশনে এমনকি সেন্টারিফুগুয়াল এবং সেন্টিপ্রেটাল ফোর্স বলেও কিছুই থাকে না –অস্তিত্ব হারায়।

অতএব এবার কি বুঝতে পারছি... মহেন্দ্রনাথ এই দৃশ্যমান জগৎ কে কেন রিফ্লেকশন অফ মাইন্ড বলেছেন...
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

এই বিজ্ঞান পর্বগুলিতে আমরা এমনভাবেই মনকে সংযুক্ত করবো যাতে বিশেষ বিক্ষেপ না হয়, তাহলে মহেন্দ্র প্রসূত ঐ চিন্তাসকল সরাসরি আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের অনেক বেশি সমৃদ্ধ করে তুলবে এবং আমাদের প্রত্যেকটি কার্যক্ষেত্রে এর সুপ্রভাব পড়তে বাধ্য।

যে agitated মাইন্ড বা আমাদের এই আধুনিক স্থূল জগতের মানুষজনের চরিত্র তথা মানসিক অবস্থার উল্লেখ করেছেন, সেখানে কীসের চঞ্চলতা.. এই প্রসঙ্গ নিজেই এনে উপস্থিত করেছেন।

এইখান থেকেই তাঁর পরিমার্জিত vibration theory বা স্পন্দন তত্ত্বের ব্যাখ্যার শুরু।

চঞ্চলতা আসছে স্পন্দন থেকে।
স্পন্দন কি থেকে সৃষ্টি হচ্ছে?
কণাদের আন্দোলনের ফলে।
আমরা কতরকমভাবে আন্দলিত হচ্ছি?
অজস্রভাবে।
এই জন্যই কি অস্থিরতা আসছে?
ঠিক তাই।
মন যে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে,এও কি ঐ আন্দোলনের ফল?
অতি অবশ্যই।
উনি সাম্য স্পন্দন বলতে কি বোঝাতে চাইছেন?
যেখানে নিয়ম মেনে, শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে(বিক্ষিপ্ত বা অসংলগ্ন নয়)
প্রকম্পিত হচ্ছে কণারা-সেই অবস্থাটি।

উপরিউক্ত চঞ্চল মনের অবস্থা কে বিভাগ-ক বলতে পারি।

ওনারই দর্শীত বিভাগ-খ হল, শক্তির ঐ সাম্য স্পন্দন এর অবস্থা।

এই দুই অবস্থার পরে আর একটা ক্ষেত্র আছে, যেটিকে বিভাগ-গ বলেছেন।

এইখানে দৃশ্ব বা দ্রষ্টা বলে কিছুই থাকছে না।
যা থাকছে তাঁকে উনি identity বা ego বলছেন।
সমস্ত গুণ এখানে তিরোহিত!
শাস্ত্রের ভাষায় শুদ্ধ চৈতন্য।

ধারণার মধ্যে অর্থাৎ যেখানে দৃশ্ব ও দ্রষ্টা রয়েছে, সেখানে ঐ সকলকে ত্রিমাতৃক কণা দ্বারা গঠিত, বলা চলতে পারে।
এরপর ঐ যখন ধীরে ধীরে দৃশ্য ও দ্রষ্টা অদৃশ্য হতে শুরু করল-সেখানে প্রথমে দ্বিমাতৃক ও পরে এক মাতৃক অবস্থায়-ঐ সকল কণাদের অবস্থান্তর ঘটতে লাগলো... এই অবস্থাগুলি আমাদের ধারণার অতীত, কিন্তু বোধের অন্তর্গত।

এই বোধ কেই স্বাক্ষীস্বরুপ অবস্থান বলা হয়-কোনো ব্যাক্তি বিশেষ কে উদ্দেশ্য করে নয়।

এখন প্রশ্ন হল কণা তত্ব না হয় বুঝলাম Formation of the Earth এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়, কিন্তু এর ভেতর 'মন' এর প্রসঙ্গ এলো কোথা থেকে?

দেখুন, যা কিছুই আমরা প্রশ্ন করে থাকি, তা তো প্রথমে মনেই উত্থিত হয় আর মনের ভেতর থেকেই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি।

তাহলে পৃথিবীর উৎপত্তি রহস্য খুঁজতে যে আমরা মনের কাছেই যাবো,এতো বলাই বাহুল্য।

এবার পর্যবেক্ষণের পর্যায়ে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করছি, এখনো পর্যন্ত এই প্রচলিত আধুনিক বিজ্ঞান পৃথিবী সৃষ্টি এবং মনের সৃষ্টি-দুটি ক্ষেত্রেই কোনও সঠিক উত্তর দিতে পারেনি।

উল্টোদিক থেকে ভারতীয়রা এই পৃথিবী গঠন,মন গঠন এবং ঐ দুই গঠনের পশ্চাতের কারণ পর্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ব্যাক্ত করেছেন।

যাঁরা এই দুরুহ কাজগুলি সম্পন্ন করেছিলেন, তাঁদের ঋষি আখ্যা বা শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা হয়ে এযাবৎ আসছে।

তাঁদের বক্তব্য এবার সঠিক ছিল কিনা-এই প্রসঙ্গে বহু বহু মানুষ, যাদের আবার আমরা সাধক ও সাধিকা এই আখ্যায় ভুষিত করি বা শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করি, তাঁরা পরিশ্রম করে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, ঋষিদের তত্ব যে একেবারে সঠিক তা উচ্চরবে ঘোষণা করে গিয়েছেন এবং ইদানিং কালেও যাচ্ছেন।
পোক্ষান্তরে এই আধুনিক বিজ্ঞানের প্রবক্তাদের ভেতর, আমরা এই শ্রেণীর মানুষ বা বক্তব্য এযাবৎ খুঁজে পাইনি।

ঋষিদের ঐ পদ্ধতি অবলম্বন ভিন্ন ঐ বিষয়গুলির রহস্য যে আর কোনোভাবেই ভেদ করা যায় না, এই ব্যাপারেও ভারতীয়রা নিশ্চিত,কারণ ঐ ঋষিরাও বহু চেষ্টার পরে, তাঁদের যথার্থ পথের সন্ধান পেয়েছিলেন।

এযুগের মহান ঋষিদ্বয় পূজনীয় স্বামী বিবেকানন্দ ও মহেন্দ্রনাথ নিশ্চিতরূপে ঋষি পর্যায়ভুক্ত এবং তাঁদের ব্যাখ্যা তাঁরা যতটা সম্ভব এই আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাক্ত করে বিশ্বমানব জাতির অশেষ কল্যাণসাধন করে গিয়েছেন।

এই ব্যাখ্যা শুধু তাত্বিক দিক থেকেই আমাদের সমৃদ্ধ করবে তাই নয়।উপরনতু আমাদের দৈনন্দিন ব্যাবহারিক জীবনেও প্রতিদিন সুপ্রভাব ফেলবে।

জগতে বা এই পৃথিবীতে আমাদের মানুষরূপে জন্ম গ্রহণের একমাত্র উদ্যেশ্য এই তত্বগুলি উপলব্ধি করা,তবেই আমরা পূর্ণকাম হতে পারবো এবং জীবনের লক্ষ্য পূর্ণ করতে সক্ষম হব।
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

মহেন্দ্রনাথে যে অসাধারণ তত্ব Formation of the Earth বইতে পৃথিবী গঠন সম্মন্ধে ব্যাক্ত করেছেন,তা বৈপ্লবিক এবং একেবারে সত্য।

উনি বলছেন,এই পৃথিবী এখনো গঠিত হয়ে চলেছে!.... এতো ভারী অদ্ভুত কথা।

কিন্তূ মোটেই তা নয়,কারণ এই পৃথিবীর স্বরূপ সম্মন্ধে আমাদের এখনো পর্যন্ত প্রায় কোনো ধারণাই নেই বলা চলে,কারণ এই পৃথিবীর গঠনে মূল উপাদান কি?

ভাব।
ভাবের ভিত্তিতেই এর গঠন।
সেই দৃষ্টিতে মাটি,জল,হাওয়া.. এসবই ভাব ছাড়া কিছুই নয়।

অর্থাৎ,এই পৃথিবী কে কে ভাবের মন্ড আমরা অক্লেসে বলতে পারি।

যেহেতু আমাদের ভাব বিকাশের কোনো সীমা নেই,আর তাই পৃথিবীর গঠনও থেমে নেই।

এই তত্ব আবার স্নায়ুতত্বর ওপর নির্ভরশীল।
এর কারণ,মহেন্দ্র মতে,ভাব=স্নায়ু।

অতএব যতই এই স্নায়ু মন্ডলীর বিকাশ ঘটবে,ততই পৃথিবীও বিকাশ লাভ করতে থাকবে।

উনি বলেছেন,পৃথিবীর ভেতরটা ফাঁকা... এ যেন একটা উলের বলের মতন,যা কোনোভাবেই সলিড নয়।
আর এই অর্থেই,তিনি কেন্দ্র কে বা পৃথিবীর ভেতর কে ফাঁকা বলেছেন।

আবার স্থূল ও সূক্ষ্ম স্নায়ুর অবস্থানের ব্যাপারে.. একটি স্তর ওপর স্তরের ওপরে উল্টোদিকে রয়েছে আর বিশেষ বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এটাই ওনার দেহ ও মন-জগতের tie knot!

এই knot খোলার উপায়-ধীরে ধীরে স্নায়ুর স্পন্দন এর মাত্রার নিয়ন্ত্রণ।

জপ এবং চিন্তন প্রণালীতেই উনি সম্মক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এতে মন ক্রমে স্থির হয়ে অন্তর জগতের রহস্য উন্মোচন করে।
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

অসাধারণ তত্ত্বের তথা চিন্তার এবং পর্যবেক্ষণের অবতারণা করেছেন মহেন্দ্রনাথ তাঁর কণা উৎপত্তি ও বিলুপ্তির ব্যাখ্যায়।

তিনি বলছেন,যখনই active state of energy বা শক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থার কথা ভাবছি তখনি কণারা উপস্থিত আর এই বিশ্ব জগৎ, অর্থাৎ কিনা দৃশ্ব-সৃষ্ট-জগৎ, এমনকি যার ভেতর আমাদের দেহ ও মন ও পড়ে যায় সবই বোধ হল।
কিন্তু ঐ কণারাই যখন তাদের উৎপত্তি স্থলে চলে যায়-সঙ্গে সঙ্গে জগৎও বিলুপ্তিলাভ করে!
তবুও কিছু যেন থেকে যাচ্ছে, তাই তো?
কারণ কণারা তো তাদের উৎসে গমন করল, কিন্তু সেই উৎস তো রয়েইছে,এতএব কণাদের বিলুপ্তি ঘটলেও, অন্য কিছুর বিলুপ্তি ঘটলো না, কারণ উৎপত্তি ও লয় -এই দুটোই তো পর্যবেক্ষণের সীমার মধ্যেই থাকছে...

তাহলে কে ঐ পর্যবেক্ষণ করছে?

আসল বা খাঁটি আমি এবং আপনি!

সেকি? জগৎ বিলুপ্ত হয়ে গেলে-আমরা বেঁচে থাকতে পারি কি করে?
কোনোকালেই আমাদের মৃত্যু ছিল না বলেই.. এরকম হয় নাকী?
যদি নেই হতো তাহলে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দর্শন, যা পোক্ষান্তরে আধুনিক বেদান্ত দর্শন..তা কি আমরা পেতাম, বুঝতাম, না উপলব্ধি করতে পারতুম।

আবার চলে আসি কণাদের পরিমন্ডলে.. যে অবস্থায় ওদের লয় ঘটে পৃথিবীর লয় ঘটে তখন কি হয়?

মহেন্দ্রনাথ সেই অবস্থাকেই বলছেন dormant state of energy বা শক্তির সুপ্ত অবস্থা।

শক্তি শব্দটা কিন্তু উনি ত্যাগ করলেন না দেখুন।
তার মানে শক্তির পারে যাবার রাস্তাও খুলে রাখলেন।

শক্তির ভেতর থাকসকালীন অবস্থা কে monocentric আখ্যা দিয়েছেন আর শক্তির পারের অবস্থা কে চিহ্নিত করেছেন polycentric নামে।

তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে, ঐ polycentric অবস্থায় আমরা তথাকথিত ভাবে না থাকলেও, আমাদের বোধ জাগ্রত থাকছে.. এই বোধই বেদান্তর সার... ব্রম্ভ, মহেন্দ্রনাথের ভাষায় ego... যেখানে ব্যাক্তি আপাত ব্যাক্তিত্ব ত্যাগ করে অনন্ত ব্রম্ভের সঙ্গে একিভূত হয়... যা আসল ব্যাক্তিত্ব।

ফলত এই ব্রম্ভে মিশে যাওয়া আর ফিরে আসা নানান গুণ নিয়ে.. এই রহস্যর নামই হল স্নায়ুদর্শন।

নানান dimension, কার্ভাচার,motion এগুলোই হল মূল কারণ, তাই এরা কারণ স্নায়ুর পর্যায়ে পড়ে। মনের দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে নানান ভাবের বিকাশ-এগুলো সূক্ষ স্নায়ু আর এরও নিচে আমাদের এই সাধারণ দেহ ও দর্শন নিয়ে স্থূল স্নায়ুর জগৎ, যাকে আমরা পরিদৃশ্যওমান জগৎ বলে চিনি।

এইখানেই যত বলের ছড়াছড়ি আর ego বা ব্রম্ভতে কোনো বলই নেই... তবুও তা সর্ব প্রকার বল ও শক্তির উৎপত্তির কেন্দ্র ও ক্ষেত্র... অনন্ত,অসীম, আনন্দময় অস্তিত্ব-আমাদের সকলের!

Excellent explanation. 👌🏻👌🏻👏🏻👏🏻👏🏻I think Transformation of Energy vis-a-vis E=Mc2 all are inter linked with param-Brahma as well as Purnadarshan philosophy. 👏🏻👏🏻👏🏻

মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

এমন সব গভীর বিষয়ের তর্জমা করেছেন,যে সত্যিই বিস্মিত হয়ে পড়তে হয়।

দিচ্ছেন কণাদের বংশ পরিচয়.. এই বংশের আদি পুরুষ বা প্রকৃতি যাই বলা হোক না কেন, তিনি হলেন সক্রিয় শক্তি,আর বিকশিত হবার ইচ্ছায় যখন নানান রশ্মি উৎপাদন করে এবং এক বিন্দুতে মিলিত করাতে জন্মলাভ করল যে শিশুটি,তার নাম রাখা হল atom!

এই শিশু আবার পরে বড় হয়ে দুই পরবর্তী প্রজন্মের সূচনা করল :
১-সূক্ষ জগৎ বা সূক্ষ স্নায়ুমন্ডল
২-স্থূল জগৎ বা স্থূল স্নায়ুমন্ডল।

এই atom নামক শিশু কিছুতেই কিন্তু স্থির থাকতে পারেনা-ভীষণ ছটফটে ধরণের, মহেন্দ্রনাথের ভাষায় high state of agitation.

এই দুই জগতের দুই শিশু খুব ক্রিয়াশীল আর সৃষ্টিশীল ও বটে, তাই নীরবছিন্নভাবে নানান গুণ সম্পন্ন জিনিস উৎপাদন করে চলে!
এই যেমন গ্রহ, তারকা থেকে প্রাণী,ধাতু, গাছপালা কত কি... যার কোনো শেষ নেই।

এইভাবে চলতে চলতে তাদের সৃষ্ট এই মানুষ নামক প্রজন্ম যখন সৃষ্ট হল, মানে এই স্থূল দেহধারী প্রাণী,সে কিন্তু সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়, কারণ সে বুঝতে পেরেছে যে এমন একটা কোনো জায়গা আছে যেখানে একটু বিশ্রাম মেলে আর খুব আনন্দ হয়।

তারা চেষ্টায় নেমে পড়ে আর বংশের পূর্বপুরুষদের(!)খোঁজ খবর নিতে শুরু করে এবং তা প্রাপ্তও হতে থাকে।

এই করতে গিয়ে,সে আবার যেন মাঝে মাঝে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আর যখন ওঠে-তখন অনেকবেশি চৈতন্যময় হয়ে ওঠে।

একদিন দেখে যে তার দেহ রয়েছে বটে,কিন্তু সে উপস্থিত হয়েছে এমন এক জায়গায়-যেখানে সবকিছু হাল্কা হাল্কা আর বেশ আনন্দ হয় সেখানে।
এইসময় কে যেন হাওয়ায় বলে যায়.. তুমি সূক্ষ্মজগতে বা পুরোপুরি মনের জগতে এসে পড়েছো।

এবার সে তো বোঝার চেষ্টা করতে শুরু করে দেয়-এই জগতে ঠিক কি কি পাওয়া যায় আর এই জগতের মাহাত্ব বা চরিত্রই বা কেন এরকম।

ঘোরাঘুরি করতে করতে বেশ কিছুদিন ধরে,একসময় জানতে পারে আসলে পরমাণু বা কণাগুলো এখানে পোশাক যেন বদলিয়ে,ডুব ঝকঝকে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় পোশাক পড়েছে আর নানান ভঙ্গিমায় যেন নৃত্য করছে!
এতো দেখি স্পন্দনের নৃত্য.. যত ভঙ্গিমা,ততই রঙ আর রস যেন ঝরে পড়ে.. অজস্র রূপের সৃষ্টি করছে।

অবাক হয়ে যায় দেখে!

এমনসময় ভেতর থেকে কে বলে.. আরও তলিয়ে দ্যাখ নাআরও মজা পাবি।
আরে স্বরটা তো চেনা চেনা মনে হচ্ছে.. এতো মহেন্দ্রনাথের স্বর।

তিনি এখানে রয়েছেন -আশ্চর্য।

ডাকাডাকি করাতে উত্তর আসে.. কণাগুলো কে ভালো করে দ্যাখ তো-ওদের ভেতর কোনো স্তর আছে কিনা আর থাকলে শক্তি কিভাবে সেখানে ক্রিয়া করছে।

আরও একাগ্র হয়ে পড়ে ঐ কথা শুনে আগন্তুক।

গভীর পর্যবেক্ষণ শুরু করে দেয় সে আর একেবারে চমকিয়ে যায়... সত্যিই তো একটা নয় তিনটে স্তর আর শক্তির রহস্য অনুভব করে।
ক-এদের একটা কেন্দ্রীয় শক্তি রয়েছে
খ-পরিধির শক্তির প্রকাশ একটু অন্য ধরণের
গ-আর ওদের আচ্ছাদন এরও একটা আলাদা শক্তি রয়েছে।

এইসব দেখার পরে মহেন্দ্রনাথ কে এসে বলাতে, উনি বললেন এবার তুলনা করে শুধু দ্যাখ তো এমন কোন কি বস্তূ আছে যার কোনো কেন্দ্র নেই, যার কোনো dimension বা তল বা আকার নেই,আর আচ্ছাদন বা envelope নেই..

তুড়িও দর্শক আবার নিমগ্ন হয়ে পড়ে একাগ্রতার সমুদ্রে আর মিলিয়ে দ্যাখে আর তারপর প্রণাম জানায় শ্রীগুরু, মহান শিক্ষক মহেন্দ্রনাথকে।
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

পৃথিবীর ভেতর অনেক পৃথিবী...!

হ্যাঁ, মহেন্দ্র তত্ত্ব অনুসারে একেবারে এই কথা বলা যায় যে এই আধুনিক পৃথিবীর ভেতর অনেক পৃথিবী রয়েছে।

ব্যাপারটা কিরকম একটু বলি,আসলে আগেই জানিয়েছি যে পৃথিবী নামক বস্তূ ভাবের মন্ড ছাড়া আর কিছুই নয় আর তাই আমাদের নিজেদের ভাবের পরিবর্তন ঘটলেই-ঔ পৃথিবী দর্শনের রূপও যায় বদলিয়ে।

মহেন্দ্রনাথ তাঁর স্নায়ুতত্ত্বতে যে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ স্তরের কথা বলেছেন, এটাই তার স্বাক্ষ্য দেয়।

আমাদের শাস্ত্রে ঐ একই ব্যাপার কে নানান সমুদ্র বা তল সংজ্ঞায় চিহ্নিত করা হয়েছে।
যেমন ক্ষীর সমুদ্র ইত্যাদি, আবার পাতাল,রসাতল পর্যন্ত।

তার মানে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের গবেষক তথা বিজ্ঞানীরা জ্ঞানের কোন সীমায় পৌঁছেছিলেন।

এই তত্ত্বসকল কে ভিত্তি করে তাই সহজেই বলা যায় পৃথিবী কোনো সলিড মাশ নয়-এর ভেতর বহু স্তর রয়েছে কেন্দ্র পর্যন্ত।
প্রত্যেকটা স্তরের চরিত্র ভিন্ন।
আর তাই এ কথা বললে মনে হয় যে কেউ প্রতিবাদ করবেন না..যে এই আধুনিক পৃথিবীর ভেতর অনেক পৃথিবী লুকিয়ে রয়েছে।

কিন্তূ মজার ব্যাপার হল-একটা পৃথিবী আর একটা ভেতরের পৃথিবীর সঙ্গে স্নায়ুর সুতো দিয়ে জোড়া!

এই করতে করতে একসময় সেই স্থূল পৃথিবীর স্নায়ু থেকে সূক্ষ্ম পৃথিবীর স্নায়ুতে প্রবেশ আর শেষে কারণ স্নায়ুর পৃথিবী দর্শন।

এবার অনেকরকম পৃথিবী দর্শন ও তাদের নিজ নিজ চরিত্রগুলো জানার পরে যেই আরও গভীরে প্রবেশের প্রয়াস করলেন অমনি সব পৃথিবী উধাও হয়ে গেল আর আপনিও আর নেই... রয়েছে শুধুই আপনার আসল স্বত্তা.. যা ব্রহ্ম বা অসীম জাগ্রত আনন্দ ময় ক্ষেত্র যার কোনো পরিবর্তন নেই, ছিল না এবং থাকবেও না.. এটিই পৃথিবীর কেন্দ্র!
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

প্রাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহেন্দ্রনাথ আমাদের এযাবৎ প্রচলিত সমস্ত থিওরি কে নস্যাত করে,ওনার নিজস্ব সরাসরি দর্শন প্রসূত সিদ্ধান্ত কে উপস্থিত করেছেন।

যদিও বলছেন জগৎ প্রাণে পরিপূর্ণ,আবার এও বলছেন যে প্রত্যেকটি atom এ life রয়েছে।
এরপর যুক্ত করছেন তাঁর ব্যাখ্যায় যে, প্রত্যেকটা conceivable object এ প্রাণের বিকাশ বিশেষরূপে দেখতে পাই।

এখানেই শেষ নয়-যে বৈপ্লবিক উক্তি এবার করছেন,তা হল–terrestrial orbs আর firmament প্রধানত এই দুই ক্ষেত্রে প্রাণের চরিত্র ভিন্ন!

আমরা তো প্রাণ বলতে সাধারণ ভাবে একটি ধারণাই পোষণ করি, কিন্তূ প্রাণের চরিত্র-বিভাগ তো করা হয় নি।

তাহলে এক্ষনে বিচার্য, কি অর্থে, এমন উক্তি।

শুরু করেছেন এইভাবে যে, যেহেতু শক্তির সক্রিয় অবস্থা থেকেই atom এর সৃষ্টি, তাই তা প্রাণপূর্ণ হতে বাধ্য।
পরবর্তীতে বলছেন,এই যে জগৎ নামক manifestation এর কোথাও কোনও void বলে ব্যাপার নেই, সমস্তটা atom এ পূর্ণ, পরের পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হল... বিশেষ বিশেষ স্পন্দন মাত্রা,তল, curveture এবং গতির ফলস্বরূপ আমরা অসংখ্য বস্তূ দর্শন করে থাকি আর এই সমস্ত বস্তূই প্রাণময়।

তার মানে বস্তুগুলিকে যার ভেতর আমাদের সাধারণ দেহ ও মন ও পড়ে এগুলিকে উনি peripheries হিসেবে ধরেছেন আর ত্রিমাতৃক কণা,তথা atom সৃষ্টির ক্ষণ কে ধরেছেন firmament হিসেবে।
এই দুই মেরুর প্রাণের বিকাশের এবং উপস্থিতির সংজ্ঞা স্বরূপ সিধান্ত প্রকাশ করেছেন।

এই আলোচনার ক্ষেত্রটি বিশাল এবং আধুনিক গবেষণার প্রভূত সুযোগ এর মধ্যে নিহিত।

স্বামীজীর বক্তব্য অনুসারে যে প্রাণের আকাশে লয় হবার কথা পড়ি আর যা নিয়ে Nikola Tesla তাঁর জীবনের শেষ প্রায় ৩০বছর কাটিয়ে গেলেন,সেটি তবে কি?

খুব অল্প কথায় বলতে গেলে... শক্তিতে যদি 'ইচ্ছা' নামক চরিত্র না থাকতো, আমরা কোনো কিছুই perceive করতে পারতুম না,তাই ইচ্ছাশক্তি কথাটি এতোই গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত প্রাণেসঙ্গে শক্তি শব্দ যুক্ত হয়ে প্রাণশক্তি বলছি আর এর বিকাশ কেই, আমাদের সাধারণ বোধে মুভমেন্ট কে প্রমাণ এবং অনুভব হিসেবে গ্রহণ করছি, কিন্তূ ঐ প্রাণের উৎসে আমরা পৌঁছোতে পারছি না।

এটা করতে গেলেই আমাদের মনের বিভিন্ন স্তর স্বজ্ঞানে অতিক্রম করতেই হবে আর দর্শন-পর্দা ক্রমশ তার অতীতের দিকে সরতে থাকবে সমানভাবে।

যে পর্যায়ে গিয়ে পর্দাই শুধু রয়েছে-এই বোধ বিরাজ করবে যেখানে দর্শন শব্দটিও গুরুত্ব হারাবে... সেই অনুভূতির বর্ণনা স্বামীজীর ঐ উক্তি।

আকাশ অর্থে এক্ষেত্রে পূর্ণ,অসীম আনন্দময় আমাদেরই অপরিবর্তনীয় অস্তিত্ব!
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

বলছেন ধীরে ধীরে বস্তূ গঠন সম্পর্কে।
বস্তূ কে lump আখ্যা দিয়ে বর্ণনা করছেন-যে এগুলি কোনোমতেই সলিড মাশ নয়,এর ভেতরে অসংখ্য কণা নিজ নিজ ভাবে আন্দোলিত হচ্ছে,এ তত্ব তো আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করে আর ফিশন ও ফিউশন দুটিই এই ঘটনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিক ভাবে জড়িত।

মহেন্দ্রনাথ কিন্তূ আরও বহুদূর এগিয়ে গেছেন আর শুনিয়াছেন অনেক গভীর প্রদেশের কথা।

এক্ষেত্রে উনি এনেছেন opposite current এর প্রসঙ্গ।

কি এই opposite current?
যেহেতু গতিবিহীন অবস্থায় কোনো lumpই গঠিত হতে পারেনা,তাই গতি কে বিদ্যুৎ প্রবাহ বলছেন, জলের প্রবাহের মতন।
কণার একটি lump গঠনে নিজেদের চরিত্রের স্বাক্ষর প্রত্যেকটি স্তরে বা পর্যায়ে রেখে থাকে.. তাই বলছেন, propelled by energy, enveloping energy আর bit of energy- এগুলো সবই একটি কণার চরিত্র বিশেষ। এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত vibration তত্ব।
যাকে কণাদের আন্দোলন আগেই বলা হয়েছে, সামান্য মিল খুঁজে পাওয়া যায় quantum physics এর সঙ্গে যেখানে অকল্পিত উপায়ে নানান কণা-বিচ্ছুরণ এসে উপস্থিত হয়, যাকে উনি বলছেন-different dimention and কার্ভাচার, অর্থাৎ, সোজা কথায়... নানান বস্তূ সৃষ্টির মূল রহস্য।

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আন্দোলন থাকলেও, স্পন্দন মাত্রা ভিন্ন,তাই নানান বস্তূ।

কিন্তূ এক্ষেত্রে বিচার্য... এখানেও কি কোনো শৃঙ্খলা নেই?

অবশ্যই আছে আর একে আমরা ভাব-শৃঙ্খলা বলতে পারি, কারণ এমন কোনো বস্তূ নাই, যার কোনো ভাব নাই!

অতএব ঐ ভাবের বহিরপ্রকাশ বা manifestationই হল বস্তূকে দৃশ্বমান করার মাধ্যম।

বারবার তুলে ধরেছেন শক্তির active ও dormant state এর কথা, কারণ ওনার মতে প্রত্যেক বস্তূতে উপস্থিত -শক্তির ঐ দুই অবস্থাই।

তার মানে সহজেই অনুমেয় যে প্রত্যেক বস্তূর ভেতর একটা পথ অবস্থান করছে যে পথ যুক্ত করে রেখেছে স্থূল ও সূক্ষ্ণ কণাদের।

এর থেকে প্রমাণিত হয় প্রত্যেক বস্তূর 'মন' আছে!
ঐ মন সূক্ষ্ণ কণা, যাদের আক্ষরিক অর্থে কোনো ভর নাই বললেই চলে।

আমাদের ভারতীয় দর্শন যাদের তন্মাত্র বলছে।
পরবর্তীতে সংযোজিত করেছেন.. একটি স্তর, ওপর বা নিচের স্তরের ঠিক উল্টো দিকে বিরাজ করে করে-বস্তূ গঠন করছে।
অর্থাৎ, তাঁর ঐ laws of opposite current এটাই।

আসলে আরও গভীর পর্যবেক্ষণের ফলস্বরূপ বোঝা সম্ভব হয়-এই জিগজাগ পথ আমাদের চিন্তনের গতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মৃত্যু অর্থে ওনার বক্তব্য... শুধুমাত্র একটি স্তরের গতি প্রবাহ বন্ধ!

একটা তার রয়েছে, কিন্তূ বিদ্যুৎ প্রবাহ চলছে না।
টিকা:
মনে হয় ছোট ছোট টিকা মাঝে মাঝে একটু করলে প্রসঙ্গ কিছুটা হলেও প্রাঞ্জল হতে পারে।
মহেন্দ্রনাথের স্নায়ুতত্ব অনুসারে বর্তমান বিজ্ঞান এর পরিধি মোটেই খুব বিস্তৃত নয় আর তা এখনো স্থূলক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
এযাবৎ প্রচারিত কোনো তত্বই তা বিগ ব্যাং থেকে, বুটস্ট্রাপ বা স্ট্রিং কিছুই সঠিকভাবে জগৎ সৃষ্টি রহস্য উন্মোচন করতে সক্ষম হয়নি।
ওদিকে Unified field থিওরির, পরবর্তী গবেষণা থমকিয়ে গেছে।
তুলনায় সূক্ষ্ণ জগৎ এর পূর্ণ রহস্য মহেন্দ্রনাথ প্রমাণ সহযোগে তুলে ধরেছেন ও যথোপযুগি ব্যাখ্যাও করেছেন।

পূর্ণচেতনা ভূমির খবর (অনুভব) এই সূক্ষ্ণ ভূমির ভেতর দিয়ে না চলে পাওয়া সম্ভব নয়।
মহেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান টিকা ছাড়া বোঝা খুব ই কঠিন, মনে রাখা আরও কঠিন । একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা প্রাঞ্জল হবে । নীচে স্বামী রঙগনাথানন্দজীর একটি কথোপকথনের বঙ্গ অনুবাদ উপনিষদের শ্লোক কেমন সহজ করে বলছেন।

I can conclude that Purnadarshan 's science is the absolute science which can be illustrated with the basic knowledge of philosophy, mythology, anthropology, geography,4 dimensional views any many more which is beyond my thinking.It is our ignorance ,Till today we have no concrete program's to propagate Mohendra science. 👏🏻👏🏻👏🏻
Please note that your inquisitive illustrations are more than 'Outstanding',I mean from any Government authorities.

মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

বস্তূ গঠনের রহস্য

এইভাবে আদৌ আধুনিক বিজ্ঞানে চিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে কিছুই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়না–বস্তূ গঠনের কারণের প্রেক্ষাপটে!

Atom বা কণা তত্ব এযাবৎ যতটুকু আলোচিত হয়েছে তাতে সক্রিয় ও সুপ্ত উভয় শক্তির অস্তিত্ব, আলোচনার সুবাদে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তূ ঐ ত্রিমাতৃক কণা কীভাবে ঐ তিনটি তল গঠন করতে সক্ষম হল,সে আলোচনা বিস্তৃতভাবে হয় নি।

যেহেতু ত্রিমাতৃক স্তর বা জগতে আমরা বসবাস করছি,তাই স্বভাবতই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হচ্ছে ঐ তিন তল বিশিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যেই আর এরই ভেতর দিয়ে ক্রমশ আমাদের চেষ্টা থাকবে... চিন্তায় ঐ কণাকে বিশ্লিষ্ট করে দেখার শুধু নয়-বোধ করার।

যাই হোক,যেকোনো বস্তূ গঠনে কণাদের উপস্থিতি ও সংঘবদ্ধতা স্বীকার না করে উপায় নেই,যদিও ঐ কণা দিয়েই পূর্ণ সমস্ত জগৎ... তবুও কেন তাদের সঙ্গবদ্ধ হবার প্রয়াস?

মজার ব্যাপার এই যে–সমস্ত ক্ষেত্রই যদি কণাতে পূর্ণই হয়ে থাকে,তাহলে সেই পূর্ণতার ভেতর কীভাবে বস্তূ আবার গঠিত হতে পারে,মানে সোজা কথায় রূপ ধারণ করতে পারে?
শুধু তাইই নয়,সেই সব বস্তূসকল আবার নানান চরিত্রও প্রকাশ করতে পারে..

এমত অবস্থায় আমাদের এবার বই পত্র গুটিয়ে নিজেদের সাহায্য,মানে নিজেদের বুদ্ধি ও বোধের সাহায্য নেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো উপায় নেই।

যদি বলা হয় সব বস্তূই শুধু নয়,পুরো জগৎই আমাদের চিন্তার পরিস্ফুটন মাত্র,তাহলে অবশ্যই আজকের যুগে তা কজনের কাছে ভেবে দেখার বিষয় হিসেবেও যে পরিগণিত হবে,তা সন্দেহের ব্যাপার।

তবুও সত্য কে ধারণ করে পথ চলা ভিন্ন উপায় নেই

স্বভাবতই প্রশ্ন আসতে পারে যে,ছোটখাটো বস্তুর ব্যাপারে না এ কথা মেনে নেওয়া গেল,কিন্তু সব মহাজাগতিক বস্তু,এমনকি এই বিশাল পাহাড়,মহাসমুদ্র,মরুভূমি.. এসব কি করে চিন্তার ফল হতে পারে?

আমার মতন শ্রেণীর মানুষ হয়ত তা চিন্তন ক্ষেত্রে আনতে সক্ষম হবেন না,কিন্তু মানুষেরও তো আরও অনেক উচ্চ উচ্চ অবস্থা আছে.. এটা একটু এগোলেই বোঝা স্বচ্ছন্দে যায়।

যাদের কথা সহজে হারিয়ে যায় না,যুগ যুগ ধরে আমরা গ্রহণ করি বা তাচ্ছিল্ল করি... তবুও স্বচ্ছন্দে থেকে যায়-তাঁরা কি উচ্চস্তর ভুক্ত নন আর মনুষ্য দেহধারীও কি ছিলেন না?

স্বয়ং স্বামীজী শোনাচ্ছেন... বুদ্ধের চেয়েও উচ্চ অবস্থার ব্যাক্তি রয়েছেন,কিন্তু নামতে পারছেন না! যে প্রসঙ্গে আলোচনা চলছে,তাতে ছেদ দিচ্ছি না.. Just একটু গতিপথটা বদলিয়ে দিচ্ছি।

আচ্ছা,আমরা তো এতোরকমের চিন্তা করি,কিন্তু এই চিন্তার রহস্য কি ভেদ করতে সমর্থ হয়েছি? মানে সোজা কথায়-এই 'চিন্তা'ব্যাপারটা ঠিক কি,এ নিয়ে গবেষণার ফল কি বলে..

আমরা চিন্তা কে অনুসরণ করি,না উল্টোটা?

আসলে সমস্ত সমাধান যুক্ত রয়েছে গতিপথের সঙ্গে,আর সত্য সত্যই সত্য-কে বুঝতে গেলে,ঐ গতির পথরেখা follow করা ছাড়া উপায় নেই।

চিন্তা আর বস্তু,এমনকি কণা... সমস্তই এক!

চিন্তা তে যেসব চরিত্র বর্তমান,তা সমস্ত বস্তুর ভেতরও রয়েছে আর আশ্চর্যের ব্যাপার.. সেই সমস্ত রয়েছে একটা ক্ষুদ্র কণার ভেতরেও...

হ্যাঁ,এটাই সত্যি।

আমরা শুধু চিন্তাদিয়ে আঁকি বুঁকি কাটছি দিবারাত্র।

নানান পথে তাকে সাজাচ্ছি।

মহেন্দ্রনাথ এনেছেন Cohesive আর adhesive চরিত্রের প্রসঙ্গ তাঁর অপূর্ব কণা-তত্বতে।

অর্থাৎ,ঐ adhesive property থাকার জন্যই একটি চিন্তার কেন্দ্র ধরে কণাররা সম্মিলিত হয়ে বিভিন্ন বস্তু গঠন করছে আর cohesive এর জন্য কিছুকাল বাদেই,তা disintegrated হয়ে পড়ছে!

তিনি কতকগুলি মুখ্য কণা-চরিত্রের উল্লেখ করেছেন যেমন :

১) central energy

২) preservative energy

৩) protective energy

৪) peripheral energy

৫) enveloping energy

চরমে দেখা যাবে যে, Atom রাও suppositional...!

তুমি-আমি বলে সত্যই কিছু নেই... রয়েছে শুধুই সেই পূর্ণঅসীম চেতনাভূমিই কেবলমাত্র।

বাকি সবকিছু খেলার ছলে আমাদের শিক্ষা দেবার প্রণালী,বোধ জাগ্রত করার উপায়, শান্তির রাজত্বে নিয়ে যাবার পন্থা আর পরবর্তীতে ঐ খেলায় অংশগ্রহণ করার ছাড়পত্র!
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

উনি অদ্ভুত সব প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন।

শোনাচ্ছেন atomic আর organic life এর কথা।
আগেই বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক atom প্রাণে পরিপূর্ণ,আর সেই atom দিয়েই গঠিত বস্তু-যাদের উনি organic structure নাম দিয়েছেন,তাও যে, প্রাণে পরিপূর্ণ হবে-এতো বলার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু এখানে প্রাণের প্রকাশের ভিন্নতা আছে আর তাই এর পর্যবেক্ষণে-এক অতি গভীর তত্ত্ব উঠে আসে।
তাঁর মতে বস্তু গঠনের পূর্বে atom এর যে অবস্থা,তাতে potential form of energy বা life থাকছে, কিন্তু organic orbs এর বেলায়,তার চরিত্র বদলিয়ে ঐ life এর প্রকাশ ভিন্ন হচ্ছে, অর্থাৎ, বিকশিত গুণ নিয়ে সে আমাদের সম্মুখে ফুটে উঠছে।
এরও আবার variation যাচ্ছে, কারণ সূক্ষ্ম, স্থূল ইত্যাদি স্তরে আমাদের দর্শন প্রক্রিয়াও বদলিয়ে যাচ্ছে।

মনে করিয়ে দিচ্ছেন gyration of atoms এর কথাও।

যদি atom এ বা বস্তু বা প্রাণীতে প্রাণের অস্তিত্ব সর্ববস্থায় নাই থাকতো, তাহলে মোড়া মাছ আর মাংস ইত্যাদি খেয়ে আমরা বা অন্য অনেক প্রাণী শক্তি কিভাবে লাভ করতে পারে?

অতএব আক্ষরিক অর্থে extinct হয়ে গেলেও-প্রাণশক্তির মৃত্যু হচ্ছেনা,সে পূর্ণ মাত্রায় সজীব থাকছে।

এরপর সরাসরি চলে আসছেন বস্তু গঠনের অন্দরে।
ছোট ও বড় বস্তু গঠনের প্রযুক্তি যে ভিন্ন, সেই কথাই এবার বলছেন।

প্রশ্ন তুলছেন... যে সব বস্তু আমরা নিত্য দেখে থাকি-সেসব বস্তু কি পুরোপুরি সলিড না adhesive আর cohesive চরিত্রের জন্য atomগুলি একটিভাবকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ হয়েছে মাত্র?

পর্যবেক্ষণের ফল দৃঢ়ভাবে উপস্থিত করছেন... বলছেন, বড় orbs এর কাছাকাছি থাকা ছোট satellite orbs দের gyration rapid,এতে solidarity maintained হচ্ছে আর বিপরীতমুখী শক্তির ক্রিয়া তো আছেই।

এক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা মহেন্দ্র নাথের স্পন্দন তত্ত্বর সঙ্গে motion এর সংযোগ যখন ব্যাখ্যা করবো,তখন আশা করি আরও ভালোভাবে এই ব্যাপার প্রাঞ্জল হবে।

পরবর্তীতে চলে আসছেন বড় orbs এর গঠন ব্যাখ্যায়।

এক্ষেত্রে প্রযুক্তি ভিন্ন চরিত্রের।
এই বড় orbs রা মোটেই সলিড গোত্রের নয়,শুধুমাত্র একটি বিশাল ভাবের প্রকাশ স্বরূপ হয়ে আমাদের দর্শন গোচর হচ্ছে।

আমরা ঐসব orbs কে ধরতে এই স্থূলভাবে মোটেই পারবো না, কিন্তু দর্শন করছি–এটা সর্বদা অনুভব করবো!

এটি ভাব বা স্নায়ু মধ্যস্ত কল্পনা তথা চিন্তন ক্ষেত্রে প্রবেশের ফল।

আমরা ওদের চরিত্র নিয়ে অনেক আলোচনা করতে পারি, দূরত্ব নির্ণয় করতে পারি, কিন্তু সঠিক তথ্য জ্ঞাত হবে না।
তাই তথাকথিত গ্যালাক্সি, গ্রহদের সংখ্যা, তারকাদির রহস্য... রহস্যই থেকে যাচ্ছে!
Absolute science tells atomic configuration with the balancing motion creates the miracle creativity in this Universe which is 💯 supported by Purnadarshan.
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

আগেই বলা হয়েছে যে, মহেন্দ্রনাথের তত্ত্বগুলি অনেকটাই ব্যাতিক্রমী, আমাদের এতদিনের জানা ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে।

বলছেন,একই সূর্য দেখেনা বিভিন্ন গ্রহ, প্রত্যেকটা গ্রহ থেকে সূর্যকে বিভিন্নরূপে দেখা যায়।

যে সূর্যের গুনাগুণ এই পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বা গ্রহণ করছিও বলা যায়, অন্যান্য গ্রহগুলি কিন্তু সেই একই গুণসকল গ্রহণ করছে না বা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও নেই।

অতি বেশীরকম agitation এর ফলে এবং কেন্দ্রীয় শক্তির প্রভাবে যে সূর্য গঠিত হয়েছে এবং আমাদের প্রধান সরবরাহকারী বিভিন্ন গুণের বলে পরিগণিত হয়েছে,তার সম্মন্ধে আমরা এখনো পর্যন্ত অতি অল্পই জানি।

অজস্র অনাবিস্কৃত গুণ ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার নিশ্চিতভাবে করবেন,এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমাদের যে ধরণের গুণ দরকার এই পৃথিবীর জন্য,যেমন তাপ,আলোক ইত্যাদি-তা আমরা পেয়ে যাচ্ছি।
অন্যান্য গ্রহের অন্যধরণের গুণ দরকার,তাই সেখানে সেইধরণের গুণের বিকাশলাভ ঘটছে।

এখন প্রশ্ন কীভাবে হচ্ছে আর গুণগুলিই বা আদপে কি?

বিভিন্নমাত্রার স্পন্দন শুধুমাত্র।এই স্পন্দন যদি আমাদের স্নায়ুগুলিতে অনুভূত না হতো-একটা গুণ বোঝাও বা অনুভব করা আমাদের পক্ষে সম্ভব আদৌ ছিলোনা।

ব্যাপারটাকে উল্টোদিক থেকে পর্যালোচনা করলে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে...

আমাদের স্নায়ুগুলি যে যে মাত্রায় স্পন্দিত হচ্ছে,ঠিক সেই গুণের বিকাশ আমরা দর্শন ও অনুভব করছি।

আরও তলিয়ে দেখলে-এমনও কি হতে পারে যে,যাকে আমাদের উৎস স্বরূপ সূর্য বলা হচ্ছে... তা আমাদের ভেতরেই রয়েছে?

শুধু তাইই নয়,যাকে আমরা বিভিন্ন গ্রহ ইত্যাদি নিয়ে সূর্যকে কেন্দ্র করে সৌরমন্ডল বলছি... সেটাও আমাদের ভেতরেই অবস্থিত আর তার পূর্ণ প্রকাশ অর্থাৎ সেই সৌরমন্ডলের চরিত্র সম্মন্ধে ধারণা এখনো শিশু পর্যায়তেই রয়েছে।

আমরা নিজেরাই নিজেদের চরিত্র আবিষ্কারে এখনো সিদ্ধ হই নি।

কিন্তু মহেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যাক্তিরা এই সিদ্ধ অবস্থা বহু বহু পূর্বেই লাভ করে... সিধান্ত গুলি প্রকাশ করেছেন..
Again I must tell it is totally Absolute/Abstract Science which is based on Param Brahma which is main source of energy.Manifestation of Energy can be illustrated with Purnadarshan ideology.Just imagine kora jai na ki bhavnar rashat uni eai prithibi ke diye gelen. 👌🏻👌🏻👌🏻👏🏻👏🏻👏🏻
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

সৌরমন্ডলের প্রসঙ্গে বলছেন,যে কেন্দ্রীয় আর বিচ্ছিন্ন অবস্থার কণারা নিজ নিজ উপস্থিতির স্বাক্ষর প্রদান করছে-তাদের ভেতর সংযোগের ভিত্তিতে,কেউ কারুর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়... যোগসূত্র রয়েছে বৈদ্যুতিক আবেশের মাধ্যমে আর তাই নানান মহাজাগতিক পরিবর্তনও সাধিত হতে পারছে।

অতএব মহেন্দ্র philosophy তে void এর স্থান নেই,যা রয়েছে তা ওনার উদ্ভাবিত Theory of Continuity র ব্যাখ্যা।

যদি মহাশুন্যে void বলে কিছু থাকতো,তাহলে এই বিদ্যুত প্রবাহ জনিত আবেশ কোনোভাবেই কার্যকরী হতে পারতো না।

আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, বড় বড় মহাজাগতিক বস্তূগুলির সম্মিলিত কণারা high state of agitation এ থাকে, ফলত তাদের ঘুর্ণাওমান অবস্থায় যে ঝাঁকুনি বা জার্ক হয়,তার জন্যই ছোট ছোট মহাজাগতিক বস্তূর উদ্ভব হয়ে থাকে, যেমন আমাদের পৃথিবীর ক্ষেত্রে চন্দ্রের উদয়... এক উপগ্রহ হিসেবে।

অন্যান্য গ্রহদের ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়ম কার্যকরী,আর সেহেতুই নানান উপগ্রহ ঐসব গ্রহদের চারিপাশে ঘুরছে,মূল গ্রহগুলিকে কেন্দ্র করে।

Meteors দের ক্ষেত্রে ওনার বক্তব্য যে Earth এবং তার satellite যেমন Moon- এর দূরত্বর প্যাসেজ এর মধ্যেই ওদের অবস্থান এর ওদের চরিত্র সলিড প্রকৃতির।

এইসব মিলিয়ে সৌরজগৎ গঠিত সংক্ষেপে এর এই গঠনের পশ্চাতে উপস্থিত স্পন্দন,গতি এবং কণাদের নানান রকমারি সক্রিয় এবং agitated অবস্থা।
Actually I mean to say Absolute / abstract Science based on philosophy which exists in this Universe but still under scanner for ultimate conclusion.
Sanjaybabu, I think a Philosopher can visualise/ realise the facts of this Universe by his intelligence/ logical mind.In reality a scientist have to establish those philosophies by experimental analysis.So we can conclude Purnadarshan as a philosophical scientist. 👌🏻👌🏻👌🏻👏🏻👏🏻👏🏻
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

এবার শোনাচ্ছেন Atmossphreic Zone তৈরী হবার কথা।

এর আগেই বলে নিয়েছেন যে বিভিন্ন চরিত্রের অর্থাৎ গুণাগুণ এর জন্যই বিভিন্ন গ্রহের সৃষ্টি,যে সমস্তগুণের বৃহৎ অংশই এখনো পর্যন্ত অধরা।

Central Mass এর থেকে এই বড় মহাজাগতিক বস্তূগুলি বহুদূরে অবস্থিত একথা ঠিক, কিন্তু ঠিক কতদূরে তা সঠিকভাবে নিরুপিত নয়।

এই বস্তুগুলিকে ঘিরে যে কণাদের আন্দোলন,তা অনেকটাই বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির–তুলনায় ছোট বস্তুতে এই কণারা অনেকবেশী সঙ্গবদ্ধ অবস্থায় থাকে।

অতএব গ্রগদের চরিত্রের সঙ্গে সেই গ্রহদের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জড়িত বা যে পরিবেশ সেই সেই গ্রহসকল কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তার ভেতর ঐ গ্রহগুলোর নিজস্ব গুণের প্রতিফলন এবং বিকাশ হচ্ছে এও স্বচ্ছন্দে বলা যায়।

ওনার মত অনুসারে এই Zone প্রধানত সাতটি স্তরে বিভক্ত, কিন্তু একটি অপরটির সঙ্গে জোড়া।
অবস্থান করছে একটি স্তর অপরটির উল্টো দিকে।
এর ফলে Continuity ও বজায় থাকছে।

এই zoneগুলির আন্দোলিত কণাগুলোর মাধ্যমে এবং স্পন্দন এর প্রাবললে নানান ধরণের effluvium নির্গত হয় এবং এর বৈদ্যুতিক প্রভাব আছে।

এই নানান ধরণের effluvium বিভিন্ন গুণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর তাই চরিত্রে বিভিন্ন।

আরও এগিয়ে উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, প্রত্যেক মানুষ এবং অন্যান্য সকল বস্তূরই এই effluvium রয়েছে আর তা প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন বর্ণযুক্ত।

প্রধানত উচ্চচিন্তাশীল ব্যাক্তির effluviun কেই halo বা জ্যোতি বলা হয়।
যাই হোক এইসব Cellestial body বা মহাজাগতিক বস্তুদের থেকেও জ্যোতি নির্গত হয় এবং মনুষ্য প্রকৃতির সঙ্গে সৌসাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়।

এমনও কি হওয়া সম্ভব যে,ঐ এক একটি গ্রহ অতি উচ্চ অবস্থার মানুষেরই ভাবদেহ মাত্র?
যদিও এর স্থূলরুপ দর্শন হচ্ছে বহুদূর থেকে, কিন্তূ আদৌ তা স্থূল নয়।
টিকা:
মহেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন তাঁর দর্শন সম্মন্ধে–আমি সবটা বলবো না।
অর্থাৎ,আমাদের ভাবার অঢেল সুযোগ তিনি দিয়েই রেখেছেন।
যে প্রসঙ্গগুলি আলোচিত হচ্ছে,এগুলি সবই ঐ মহাসম্পদের পাহাড় বা আমাদের চিন্তার খোরাক বলা চলে।

আজকের প্রসঙ্গ থেকেই মূল কয়েকটি বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার অনেক সেইজাতীয় সম্পদ রয়েছে,যার মধ্যে কয়েকটি হল –
ক) দূরত্ব বলতে ঠিক কি বোঝায়
খ) দূরত্বর চরম কোনো ধ্রুবক আছে কি
গ) আমাদের বর্তমান প্রকৃতির সঙ্গে গ্রহাদির
ঘূর্ণনের কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কি আছে ইত্যাদি।
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

আমরা বেশ কিছু পর্ব অতিক্রম করে এলাম, মহেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান ভাব অবলম্বনে।

এক্ষেত্রে এবার যদি একটু আমাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে স্বয়ং মহেন্দ্রনাথের দিকে মানে বিশেষত তাঁর কর্ম কাণ্ডের দিকে ফেরাই, তাহলে আমরা কি দেখতে পাই ও বুঝতে পারি–এই নিয়ে সামান্য আলোচনার চেষ্টা এই পর্বে।

মনে হয় মহেন্দ্রনাথ ব্রহ্মান্ড ব্যাপি এক বিশাল উদ্যানে অবস্থান করছেন আর সমস্ত উদ্যান জুড়ে নানান ফুল ও ফলের গাছ।

রকমারি চোখ ধাঁধানো কতনা অজানা ফুল ফুটে রয়েছে আর সুগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত–এ সাধারণ গন্ধ নয়–দিব্যগন্ধ।

তাঁর এই বাগানের ফুলের আকর্ষণে বহু মানুষ বিভিন্ন দিক থেকে ছুটে আসছে.. আর এই ফুলগুলো হচ্ছে তাঁর অনুধ্যান পর্বের পুস্তকগুলি,যা একরকম বলা যায় গল্পের আকারে লেখা আর সমস্তগুলি জুড়ে নানান সারমর্ম সংযোজিত করা।

কে না গল্প পড়তে ভালোবাসে বলুন আর সে সব গল্প যদি আপনার মনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে পারে, তাহলে কি আর কথা থাকে?

এবার গল্পগুলি পড়ে, লেখক কে দেখার ইচ্ছা স্বাভাবিকভাবেই হয় আর তখন দেখে মহেন্দ্রনাথের ছবি, কোথায় থাকতেন, কেমনভাবে জীবন কাটাতেন এসব ও জানবার প্রবল কৌতূহল হয়।

হ্যাঁ,এই পর্যায়টাকে আমরা বলতে পারি প্রথম স্তরের মহেন্দ্র–দর্শন,মানে একটু অন্যভাবে বললে–এটা মহেন্দ্রনাথের বাহ্যিক রূপ দর্শন।

এবার ঐ রূপ দেখে বিমহিত যারা হয়েছেন আর মনে মনে চাইছেন একটু আলাপ করতে ওনার সঙ্গে, কিছু ব্যাক্তিগত প্রসঙ্গ করতে, তারা একটু ইতস্তত করে আরও ধরা যাক ওনার অন্যান্য বই পত্রের খোঁজ নিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকলেন,আর যতই দেখেন ততই মাথায় কি যেন চলে বেড়ায়!
এইসব এতকিছু নিয়ে ভেবেছেন উনি, এতো দেখি আমার সঙ্গেও যেন একটু আধটু মিলে যাচ্ছে।
এই অবস্থা এলেই বোঝা যাবে যে, ইতিমধ্যে মহেন্দ্র–দর্শনের দ্বিতীয় ধাপে, মানে অন্যভাবে কেউ নেবেন না... আমরা ওনার দেহ ভেদ করে, মানে ত্বক ইত্যাদি ভেদ করে ওনার মনের দরজায় পৌঁছে গিয়েছি।

উনিও যেন বেরিয়ে এসে ডাকছেন, যেমন ভাবে সবাইকে ডাকতেন... ও জাদু বলোনা তুমি কে, কোথা থেকে আসছো ইত্যাদি।
আর মায়েদের জন্য to তাঁর ডাক.. এসো এসো দেখি সঙ্গে আশীর্বাদ আর পরে অন্যদের বলা– আমি তো ভগবতী পূজা করি

বেশ, এতদিনে তো তবু পরিচয় হল
এই ক্ষেত্রে হয়ত আপনি পরে ফেলেছেন কিছুটা কিছুটা করে হয়ত ওনার কাব্য, সমাজ চেতনা বা শিল্প সম্মন্ধিও কিছু পুস্তক।

তার মানে, সোজা কথায় মহেন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম স্নায়ুর অন্দরে আপনার গতিবিধি দেখা যাচ্ছে।

ওনাকে আর নতুন বলে মনে হয়না,যেন এতো স্বাভাবিক ব্যাপার, এরকমই তো হবে।
তার মানে কেন্দ্র খুঁজে পেয়ে গেছেন পাঠক ও পাঠিকা অগোচরে।

এতেও হয়ত কেউ কেউ আরও একটু ঘনিষ্ঠ হতে চাইলেন ওনার সঙ্গ পেতে, সে ক্ষেত্রে কি ঘটতে পারে।

সাধারণ ধারণা থেকে বোঝা যায়,এক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা আগ্রহী নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারবেন না, কিন্তু তিনি নিজে যা করেন বা যেভাবে জীবন কাটান, সেখানে এই ঘনিষ্ঠ হবার ছাপ পড়বে।

ওদিকে মহেন্দ্রনাথ কিন্তু সব দেখছেন এবং বুঝছেন।

এইভাবে কয়েক বা বেশ কিছু বছরও কেটে যেতে পারে,কিন্তু দড়ি আলগা হয়নি, ক্রমশ ক্রমশ ওনার মনের সঙ্গে বন্ধন হয়েছে অনেক দৃঢ়!
নানান নিজের সূক্ষ স্নায়ুর স্তরে এখন আমাদের বিচরণ ধরা যাক স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

এরপর হয়ত হঠাৎ করেই, উনি আলাদা করে ডেকে কিছু বলতে চাইলেন... নিজে কিছু করতে হয়, চেষ্টা করা ইত্যাদি ইত্যাদি।
এখন তো বিজ্ঞানের যুগে বাস.. আমার ঐ বিজ্ঞান এর বইগুলো অনেক আগে লিখেছিলাম.. পড়লে আর বুঝলে ঝড় ঝাপটা এলেও সামলিয়ে যাওয়া যায় আর ভেতর ভেতর যা খোঁজে মন... সেখানেও যাওয়া যায়.. সেই কারণ *মহাকারণের দেশে।
অতএব এখন আর বিজ্ঞানের বইগুলো ওনার দেখছি বেশ বন্ধু হয়ে উঠেছে!

আশ্চর্য ব্যাপার তো..

এটা মনে হয় মহেন্দ্র-দর্শনের তৃতীয় স্তর।

মহেন্দ্র-হৃদয় দর্শন!

ভালোবাসায় একাকার... আর কিচ্ছু নেই...
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

বলতে গিয়ে উপস্থাপিত করছেন effluvium এবং সংযুক্ত তত্ব।

যা প্রায় জমাট বেঁধে একটা সলিড mass উৎপন্ন করেচর, তার চারপাশে যে অসংখ্য floating atoms রয়েছে-মূলত effluvium গঠিত ও দর্শীত হচ্ছে এই কারণেই।

এবার ঘূর্ণন ও গতি তত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বোঝাচ্ছেন যে কীভাবে এই এতো গুণ বা চরিত্র প্রকাশিত হচ্ছে বা ও প্রকাশিতও থেকে যাচ্ছে বহুলাংশে।
গতি কেও ভাঙা যায়, ধরা যাক আমরা ছুটছি,আমাদের দুই পা অল্টারনেটিভলী পড়ছে বা ক্রিয়া করছে, এবার খুব ভালো করে স্লো motion এ ছবি কল্পনা করে ভাবুন তো এই দুই স্টেপিং এর ভেতর সময়কালের ব্যাবধান থাকছে কিনা।

দেখবেন অবশ্যই থাকছে।

এই তত্ত্ব কে এবার গতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে দেখবো যে,কোনো এক চরিত্র ধরে গতির উদ্ভব হতেই পারেনা-কমপক্ষে দুটি চরিত্র লাগবেই।

আবার একটু গভীরে গেলেই বোঝা যাবে যে ঐ স্টেপিং এর দুটো পায়ের ক্রিয়া যেন দুটো চরিত্র আর এর ফলেই.. গতি নামক তৃতীয় চরিত্রের সৃষ্টি হচ্ছে।

এখানেই শেষ নয়-দু step এর মধ্যের অতি সূক্ষ্ম যে সময় উপস্থিত,সেই অবস্থায় প্রবল gyration এর ফলে বহু secondary গুণের প্রকাশ হচ্ছে।

প্রত্যেকটা গুণ বা চরিত্রের স্পন্দন আলাদা।

এই যে গতি হল,এবার সে সোজা বাঁকা যে পথেই হোক না কেন অগ্রসর হবে... তার মানে সোজা কথায়,না থাকলেও একটা বা একাধিক পথ রেখা নির্মিত হবেই-এই রেখেগুলিই মহেন্দ্র দর্শনে curvature।

গতি হল আর পথও পাওয়া গেল,কিন্তু সত্যিই আসলে ছুটছে কে?
দেখবেন চেতনা রয়েছে স্থির আর ছোটা বা গতি,এমনকি সমস্ত মহাজাগতিক থেকে সাধারণ ঘূর্ণনা=নানান মাত্রার আমাদেরই স্নায়ুর স্পন্দন ছাড়া কিছুই নয়...!
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

একটু অন্যভাবে বলা গেলে বলতে হয়,মহেন্দ্র বিজ্ঞান প্রশান্ত মহাসাগরের মতন এক মহাসমুদ্র,যার তলদেশেও নানান বিস্ময় বিধৃত রয়েছে।

এই বিজ্ঞান সাধনা বা এটির চর্চা করা কিন্তু মোটেই কঠিন নয়,কারণ এর চর্চার অগ্রগতির প্রতি পদে পদে আনন্দের ঝিলিক!

অতএব ঐ আনন্দই প্রেরণা যোগাবে আর পথেও চলা যাবে।

এর মানে কিন্তু এই নয় যে,পথে বিপদের আশংকা নেই-প্রচুর আছে,কিন্তু অবাক হবার মতন ব্যাপার এটাই যে ঐ সমস্ত বিপদ ও ভয় থেকে সর্বদা রক্ষা করেন মহেন্দ্রনাথ স্বয়ং!

এ মোটেই কোনো কথার কথা একেবারেই নয় আর এই রহস্য ভেদ করাও-বিজ্ঞান এর চর্চার মধ্যেই পড়ে।

কিভাবে তিনি আমাদের রক্ষা করছেন ও এগিয়ে দিচ্ছেন?

তাঁর ভাবদেহের স্পন্দন আমাদের স্নায়ুতে চালিত ও মিলিত করে।

ঐ ঐ স্নায়ু ঐকালে মহেন্দ্রময় হয়ে উঠছে আর ওনার মতন আমরাও সাহসী হয়ে উঠছি এবং কোনো ভাবেই পিছপা হচ্ছিনা।

আর এরও পশ্চাতে সোজা কথায় বললে যে প্রযুক্তি বর্তমান... তা হল শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ স্নায়ু প্রযুক্তি!

তাই যদি না হতো,তাহলে পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের অনুধ্যান বইটির দ্বিতীয় পর্বটি লিখতেন না।

তার মানে বুঝতে অসুবিধা হবার প্রশ্নই নেই যে ওনার স্নায়ুসকল শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্নায়ুমন্ডলীর সঙ্গে একই স্পন্দনে স্পন্দিত হত এবং এখনো হচ্ছে।

তাই আমাদের ভেতর আলোড়ন জাগছে আর আমরা একেবারে খাঁটি সত্য সম্মন্ধে জানতে ও বুঝতে পারছি।
সবচেয়ে বড় কথা আমরা দিব্য আনন্দ আস্বাদন করতে পারছি।

যে প্রযুক্তির মাধ্যমে এই আশ্চর্য ব্যাপার ঘটছে... তা কি বিজ্ঞান নয়?

পরের স্তরে শ্রী শ্রী ঠাকুর যে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর প্রসঙ্গ এনেছেন... তা আমাদের নতুন করে ভাবার ও যথার্থ সহজ পথে চলার উপাদান।

এটিই যুগ পরিবর্তনের চাবিকাঠি...
মহেন্দ্র বিজ্ঞান

এই মহেন্দ্র বিজ্ঞান এর স্বরূপ তথা ব্যাপ্তি সম্মন্ধে সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে,কিন্তু এর তল এতোই গভীর যে ধীরে ধীরে ডুব দিয়ে আমাদের সে স্থানে পৌঁছোতে হবে... ওনার নিজের কথায়,তলার বালি যদি ধরতে পারিস,তবেই আসল জিনিস পাবি।

তাই আমরা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো আর দর্শন করতে থাকবো, মহেন্দ্র-মহাসমুদ্রের গভীরে ডুব দিলে,স্তরে স্তরে কি মণিমুক্ত ও গরলের সন্ধান মেলে।

ভালো কে খুঁজতে যাবার পথে,খারাপ এসে উপস্থিত হবেই।
আবার পুরোপুরি খারাপের ভেতর থাকছি মনে করলেও, সেখানে কিছু না কিছু ভালোর সন্ধান মিলবেই।

আমাদের বেশী ভালো লাগছে,খুব আনন্দ পাচ্ছি-এসব কথা তো আমরা প্রায়েই বলি,তার মানে আমাদের পূর্বের অবস্থা যে এর থেকে খারাপ ছিল,তা সহজেই বোঝা যায়।

আমরা সিদ্ধ হতে চাইছি,অর্থেও,এই তত্ব সমানভাবে কার্যকরী।

অতএব বর্তমানে আমরা সদ্য কেনা চাল থেকে ফুটতে একটু একটু শুরু করেছি।
কোন তাপের মাধ্যমে সিদ্ধ হবার চেষ্টা করছি, মানে ওভেন কোথায়?

সর্বদা জ্বলছে-সংসার উনুন।
এতেই চাল আমি বা আমরা নামক পাত্রে চাপানো হয়েছে।

পাত্র পুড়ে যাচ্ছেনা কিন্তু,তার মানে দেহ যাহোক একটা অবস্থায় রয়েছে,ধীরে ধীরে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ফুটছে মন!

মন সিদ্ধ হবে আগে তারপর তো ঐ বাকসিদ্ধ ইত্যাদি।

এরপর ঐ সিদ্ধ গরমভাত পাতে পড়বে আর আমাদের উদর মানে এক্ষেত্রে বিশাল মনের উদর পূর্ণ হবে এবং আমরা বল বা শক্তিলাভ করবো এবং তৃপ্তও হব।

এতো গেল প্রচলিত আধার বা container এ চাল সিদ্ধ করার প্রণালী,কিন্তু নানান রকম তো পদ্ধতি আছে।

আগে একসময় পুরীর জগন্নাথদেবের রসুইখানার একটি বিশাল হাঁড়ির ওপর আর একটা চাপিয়ে-এইভাবে নটা হাঁড়ি এককেটি উনুনে চাপানো রন্ধনের জন্য দেখে,এক বাঙালি যুবক ভাবলেন,একটা যন্ত্র বানালে হয় না,এই হাঁড়ির ওপর হাঁড়ি চাপানোর মতন।
ভাবনা কাজে রূপ নিলো আর তৈরী হয়ে গেল ইকমিক কুকার!

পুরোনোরা সবাই জানেন অন্তত পশ্চিমে(কেন বলতো,জানি না)এই মধুপুর এইসব অঞ্চলে হলেও,পরিবার সব রন্ধন সরঞ্জাম,ইকমিক কুকার সমেত নিয়ে যেতেন।
সব steamed dish।একেবারে স্বাস্থ্যকর, মায় মাংস পর্যন্ত।

এবার time কমাবার জন্য উদয়-প্রেসার কুকারের।

ভিতরে ধরুন আমাদের মন সব ফুটছে আর মাঝে মাঝে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়ে সোও সোও আওয়াজ।

একসময় নামিয়ে নেওয়া।

চালের প্রথম অবস্থায়, মানে মনের স্পন্দন যা ছিল,সিদ্ধ হবার পরেও কি তাই রইলো?
মাঝখানেও কি স্পন্দন নানান মাত্রার হয় নি?

অবশ্যই হয়েছে।

ব্যাপার এখানেই কিন্তূ শেষ নয়,অনেক secondary স্পন্দনও এর মাঝে এসে ঐ ক্রিয়ায় অংশ নিয়েছে, যেমন জলের,বিভিন্ন মশলা ও তেল ইত্যাদির।

এর সঙ্গে শুরুর অবস্থায় আমাদের brain এর এবং পরবর্তীতে যে কত কত স্পন্দন,curvature, motion এই সমস্তর পরিবর্তন হয়েছে এবং কেন হয়েছে,সেগুলো আলোচনার ইচ্ছা রাখছি।

আজকের cognition ও consciousness related research এই সব ক্রিয়ার ব্যাখ্যা নিয়েই।

Brain এর অতি ক্ষুদ্র এক একটি অংশ,যেখানে অতি জটিল সমস্ত ক্রিয়া চলে এবং আমাদের দেহস্থিত কোষগুলোর structural চেঞ্জেস ঘটে,এও এই নিউরো science এর অন্তরভূক্ত।
আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্কিং ও সাথে ইন্টেলিজেন্স দিয়ে চিকিৎসার ক্ষেত্রে নানান পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে সত্য, কিন্তূ পূজনীয় মহেন্দ্রনাথের স্নায়ু-বিজ্ঞান অনেক অনেক এগিয়ে রয়েছে শুধু কালের প্রতীক্ষায় আমাদের উপযোগী করে গ্রহণ করার জন্য।
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

আবার এক অদ্ভুত কথা শোনাচ্ছেন উনি, বলছেন একটি উদাহরণ দিয়ে,যা কিনা শব্দের গতি এবং প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত।

যদি আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় আর আমরা আলো দেখি ঐ মুহূর্তে, কিন্তূ শব্দ শুনি দেরিতে,তাই তো? আর প্রচলিত আধুনিক বিজ্ঞান এক কথায় সিদ্ধান্ত করে দিয়েছে যে,শব্দের গতিবেগ কম -তাই এই ব্যাপার ঘটে।

মহেন্দ্রনাথ পুঁখ্যানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালিয়েছেন ও অনুভব তথা দর্শন করেছেন আর তারপরে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন।

উনি বলছেন ঐ মুহূর্তের শব্দের ধাক্কায়, কাছাকাছি থাকা সমস্ত কণার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আর এর ফলে শব্দ প্রবাহের মাধ্যম বিঘ্নিত হয় এবং সেই কারণের ফলে শব্দ সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাওয়া যায় না।

কিন্তূ atmospheric particles রা যেহুতু আবেশিত হয়ে পড়ে-শব্দের স্পন্দনের জন্য, তাই বিচ্ছিন্ন কণারা আবার নানান দিকে স্পন্দন পাঠাতে থাকে, আর আমরা ঐ শব্দ শুনতে পাই।
অর্থাৎ, সোজা কথায়, এই শব্দের স্পন্দনের ক্ষেত্রে দূরত্বর স্বাপেক্ষে যে সময় লাগল,তা আলোকের গতির ছেয়ে বেশী এবং এটিই কারণ।

তার মানে শব্দের চরিত্র এর জন্য দায়ী ছিল না, ছিল মাধ্যমের ক্রিয়া পদ্ধতি... আধুনিক বিজ্ঞান এখনো অবধি এই তত্ব জ্ঞাত নয়।

এই উদাহরণ,যা কার্যত এক অত্যন্ত মূল্যবান আবিষ্কার,এটিকে তিনি দর্শীয়েছেন Cosmologyর ক্ষেত্রে।

একটি গ্রহ দূরত্বর বিচারে একটি অপরটি থেকে বহু বহু দূরে রয়েছে।
প্রত্যেক গ্রহের রয়েছে নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ,যা প্রধানত নির্ভর করছে গ্রহগুলির efluvium বা আবরণীর ওপর,যে আবরণী নির্মিত বা গঠিত হয় স্বয়ংকরিয়ভাবেই floating particles এর জন্য।
এই floating nature আবার একটি তুলনায় দুর্বল গ্রহ-কেন্দ্রের বলের দ্বারা আকর্ষিত হয়।
নানান গুণের প্রকাশ,ঐ গ্রহগুলির বিশেষত periphery থেকে,অর্থাৎ বেষ্টনী,বা floating কণাদের বলয় থেকে।

এইসব নানান গ্রহের অসংখ্য গুণ এর সম্মন্ধে আমরা এখনো পর্যন্ত বিশেষ কিছুই জানি না,ভবিষৎ এর বিজ্ঞানীরা শোনাবেন সেই কথা.. এটি উনি বিশ্বাস করেন।

যেহেতু cohesive property সতত থাকে তাই floating কণাদের মতন... ঐ গ্রহগুলিও বিচ্ছিন্ন,অর্থাৎ দূরে দূরে অবস্থিত,কিন্তূ একটি নিয়মের অধীন-যেটি হল সৌর-নিয়ম বা সূর্যের নিয়মও একে স্বচ্ছন্দে বলা যায়।

ঐ পূর্বের উদাহরণ এর ভিত্তিতে,তাই দেখা যাচ্ছে-সূর্যের কেন্দ্রীয় টান বা বলের প্রভাব যেহেতু গ্রহগুলি কাটিয়ে উঠতে পারছে ন,যেটি adeshive বা আকর্ষণী বল... তাই নিয়ম মেনে সূর্য কে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকছে!

Cosmologyর এরকম অপূর্ব ব্যাখ্যা ও সাথে বিভিন্ন শক্তির যথাযথ গুণাগুণ নির্ণয় মহেন্দ্রনাথের মতন আর কেউ ইতিহাসে করেছেন কিনা জানা নেই...
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

মহাজাগতিক মহেন্দ্রনাথ..

এ কথা স্বচ্ছন্দে তাঁর সম্মন্ধে বলা যায়,কারণ তাঁর পর্যবেক্ষণ প্রণালী অভিনব,যথার্থ এবং সত্য উদ্ঘাটন এর ফল অচিরে আমাদের বোধ কে জাগ্রত করতে সমর্থ।

তাঁর Cosmic Evolution পুস্তক-এক মহাবিস্ময়!

এই মহাজাগতিক বিবর্তনবাদ আসলে মানুষের বিবর্তনবাদের প্রতিচ্ছবি বলা চলে।

অতএব চরিত্রগত দিক থেকে যেহেতু দুই বিবর্তন প্রণালী সমার্থক... কালে তাই একটি আমাদের বোধের আওতায় এলেই অন্যটি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সহজেই বোঝা যায়।

কি অপূর্বভাবে বলছেন -যখন আমরা কোনো বিষয়ের চিন্তা করি বা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চলি,তখন ইমাজিনারি অবজেক্টর সর্বদা এসে উপস্থিত হয়।

ঘটনা কি ঘটে,আমরা নিজেদের একটা সিদ্ধান্ত কে নিজের শক্তিমত দাঁড় করাই, আর এরপর বিপরীতে অন্য বহু অন্য উৎস প্রসূত চিন্তা কে ছবি স্বরূপ নিয়ে এসে,তুলনা করতে লেগে যাই। কোনটা ঠিক সিদ্ধান্ত হবে,কোনটা বেশি পসিটিভ হবে ইত্যাদি।
অর্থাৎ, duality থাকবেই।

এবার তুলনা করছেন একটি শিশুর সঙ্গে।
বলছেন শিশুর চিন্তার সবটাই পসিটিভ,সে কোনো নেগেটিভিটি দেখতে পায় না!
অতএব তার প্রতিপক্ষ বলে কিছুই নেই,কিন্তু একটু পরিণত হলেই-তা এসে হাজির হচ্ছে।

সর্বদা বিচার চলছে-ইমাজিনারি অবজেক্টর কে বসিয়ে আর এতে যে ব্যাক্তি বহুল প্রকার ঐ প্রতিচ্ছবি দেখতে ও সিদ্ধান্ত নিতে বেশী পারদর্শী.. সেই ব্যাক্তিই সমাজে এক ইন্টেলিজেন্ট ব্যাক্তি হিসেবে গণ্য হন।

মহেন্দ্রনাথ এরপরে আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছেন দেখুন.
..আসল মহাকাশের দিকে!
সে আবার কি?
মহাকাশের ও কি তবে duplicate বেরিয়ে গেছে নাকী?

না,তা ঠিক নয়,তবে এই মহাকাশ একেবারে অনেকের কাছেই প্রায় অপরিচিত বলা যায়।

ভাবছেন হয়তো Cosmology র ব্যাপারে শিশু,পূর্ণ বয়স্ক মানুষের চিন্তা এসব আবার কোথা থেকে আসছে..

মহাকাশ মানেই তো শুনবো Space Station,Polar Satellite Launch Vehicle(PSLV) ক্র্যাওজেনিক রকেট, LASER Communication,Rovers, Milki Way এইসবের কথা.. তাই তো?

আসলে মহেন্দ্র মহাকাশ চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে-এসব নগন্য।

তিনি নিজেই বলেছেন,"সর্ষের মতন দেহ ভাব দেখিয়ে,একেবারে উষ্চভূমিতে মন কে তুলে দেবো"।

তার মানে এই স্থূলজগৎ এবং সেইখানকার জ্ঞান এর ওপরে আরও অনেক কিছুই আছে।

ঐ যে ওপরে ঐ বর্তমানের jargon গুলো শুনতে যেমন আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি... ওগুলো বাদ দিয়ে মহাকাশ চর্চা কিভাবে চলতে পারে,এই ধারণা পোষণ করছি... এর আমূল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করতেই মহেন্দ্রনাথ এসেছেন।

আইনস্টাইন এর Relativity তত্ত্ব কে উনি নস্যাত করে-ওনার Continuity তত্ত্ব কে বসিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন সবকিছু।

কিন্তু আমরা ঐ আইনস্টাইন এর দুনিয়া এবং ঐ সম্পর্কিত তত্ব যেমন স্ট্রিং,বুট স্ট্রাপ ইত্যাদির মধ্যেই ঘোরাফেরা করছি।

আমরা নানান সভা,Seminar ইত্যাদি ঐসব আলোচনা চালাচ্ছি... দেশের সম্পদ খুঁজে কি দেখছি?

উনি দেহবোধ কে যে সর্ষের দানা বললেন আর অন্য অনেক উচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাবার কথা বললেন.. সেটা তাহলে কি?

এই অবস্থায় আস্তে আস্তে ঐ ইমাজিনরি object গুলো প্রথমে মিলিত হবার চেষ্টা করে,তারপর তারা আবছা হয়,আর শেষে মিলিয়ে যায়!

Identified হয়ে যায় থিঙ্কর বা দ্রষ্টার সঙ্গে.. দৃশ্য ও দ্রষ্টা এক হয়ে যায়... আর যে ভূমিতে এই অবস্থা এসে উপস্থিত হয়... সেটাই আসল মহাকাশের দরজা মাত্র!

এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে তবেই আসল মহাকাশ দর্শন হবে আমাদের..

এটাই মনুষ্যত্বের বিবর্তন.. ওনার ভাষায় Cosmic Evolution!

J
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

একেবারে বৈপ্লবিক সব তত্বের উল্লেখ রয়েছে বিজ্ঞান সিরিজ এর বইগুলোর পাতায় পাতায়!

যা বলেছেন,তার থেকে আজকের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-অনেক পিছনে রয়েছে।

আজকে আমরা Solid State Physics বা Electronics এর দুনিয়ায় বাস করছি আর এর ভিত্তি হচ্ছে Semiconductor সবাই জানেন।
এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে Super Conductor ইত্যাদি।
ইলেকট্রিসিটি পরিবহণের ক্ষেত্রে Conductor এর ভূমিকাও সবারই জানা আর Non Conductor বা Insulator এসবও এখন বাচ্ছারাও জানে।

কিন্তু ঐ conductor আর Insulator এর ভেতর কি ক্রিয়া কাজ করছে.. তা বিজ্ঞানীরাও এখনো পর্যন্ত জানেন না!

মহেন্দ্রনাথ শুধু এটা জানতেনই না-প্রমাণ ও দিয়েছেন,এই সম্পর্কের ব্যাপারে।

আগেই উল্লেখিত-ওনার তত্ব অনুসারে যে Electricity হচ্ছে কেন্দ্রীয় শক্তি।

Energyর নানান ডিভিশন,উনি প্রকাশের তারতম্য অনুসারে করেছেন।

বলছেন দেখ–wood হচ্ছে সাধারণভাবে non conductor,কিন্তু সেই wood ই যখন চারকোলে পরিবর্তিত হচ্ছে... তা হয়ে উঠছে conductor- এক অতীব আশ্চর্য ব্যাপার!

উদাহরণ দিচ্ছেন পেন্সিল এর শিস এর, যা কার্বন বা চারকোল থেকে তৈরী, এক্ষেত্রে উনি graphite বা শিশার প্রসঙ্গ আনেন নি।
ঐ পেন্সিল এর শিস তৎকালীন arc ল্যাম্প এ বিদ্যুৎ পরিবহন ও আলোতে পরিবর্তিত হয়ে প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হত।

সোজা কথায়, তার মানে wood যা ছিল non conductor- সেটাই যখন চারকোল হয়ে গেল..., তৈরী করল conduction property আর নাম উঠলো conductor এর খাতায়!

আরও বলছেন,তৎকালীন কার্বন filament বাল্ব এর ব্যাপারে,যেখানে একই principle কাজ করছে।

ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন,সাধারণ wood এ কণারা ছিল বিক্ষিপ্ত এবং অনেকটা floating অবস্থায় আর এর ফলে wood ছিল non conductor এবং ছিল এর বহু বিশ্লিষ্ট কেন্দ্র।

কিন্তু চাপ সৃষ্টি করার ফলে এবং আরও কিছু process এর মধ্যে দিয়ে এসে ঐ wood এর কণারা বিশেষভাবে সঙ্গবদ্ধ হল আর অনায়াসে তা হয়ে গেল Conductor,যার ভেতর দিয়ে Electricity আবাধে পরিবাহিত হয়
এই conductor এর একটি মাত্রই কেন্দ্র কণাদের মাধ্যমে গঠিত হয়।
তাই conductor কে ভাঙা বা break করার জন্য অতিরিক্ত বা বেশী শক্তির প্রয়োজন হয়।

এবার আরও বৃহৎ পরিমন্ডলে এনে ফেললেন!

শোনাচ্ছেন বিজ্ঞান –অমৃত বাণী :

সাদা মেঘ, লাল বর্ণের মেঘ দেখেছো তো?

ওরা জানবে floating কণাদিয়ে তৈরী হচ্ছে, তাই বিশেষ সঙ্গবদ্ধতা নেই... কিন্তু ধীরে ধীরে ঘণিভূত হতে থাকায়*ওদের বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে চরমে ঘন কালো মেঘ হয়ে গেল!

আর কি ঘটলো?

প্রবল বিদ্যুতের চমক ও বজ্রপাত..

ডিসচার্জ করল সঞ্চিত বিদ্যুৎ vibration ও friction এর ফলস্বরূপ।

মিলিয়ন মিলিয়ন ভোল্ট।

কিন্তু ঐ সাদা বা লাল মেঘের ঘর্ষণে বা স্পন্দনে এই ব্যাপার ঘটেনা।

তাই যুক্তি ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রমাণ করলেন.. Electricity বা বিদ্যুৎই হচ্ছে *কেন্দ্রীয় শক্তি।
কি চমৎকার !! আর ও এই রকম উদাহরণ দিয়ে এগিয়ে চল ,আমি আছি পিছনে ।
Purnadarshan's many more ideology is yet to be proved by modern science derivatives . Salute to this Great Philosopher who could able to feel without any pre discussed reference the logical analysis of the natural phenomenon from his inherent intelligence as well as analytic eyes. 👏👏👏👌👌👌
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

বিস্ময়কর সব তথ্য প্রদান করেছেন তাঁর সারা দর্শন পর্ব জুড়ে,যা এ যাবৎ প্রচলিত সমস্ত জ্ঞান ধ্যান ও ধারণা কে আমূল বদলিয়ে দিয়েছে।

আমরা সেই অনাদিকাল থেকে পঞ্চ তত্ত্বের কথা শুনে আসছি–ক্ষিতি,অপ,তেজ,মরুৎ আর বোম। কিন্তু পাশাপাশি যদি এই ধরণের কথা বলা যায়–electricity, heat,light,sound,nad(নাদ) তাহলে কেমন শোনায়?

অতি আধুনিক মহেন্দ্রনাথ এইরকম দর্শন প্রণালীই লিপিবদ্ধ করিয়েছেন!

Central energy-electricity কে ধরে তাঁর এই ব্যাখ্যান অভূতপূর্ব,অভিনব এবং অত্যাধুনিক।

তেজ বলছেন না,বলছেন light.. এ আবার আগুন ও নয়।

তাহলে কি থেকে এই light বা প্রথম অবস্থার spark এর উৎপত্তি?
Electricity থেকে।

ঘোড়ার ক্ষুর এর প্রসঙ্গ এনেছেন,শুনিয়েছেন পাথর ঘষে spark বা লাইট উৎপাদনের কথা,যার মূল উৎস হল Electricity আর এই ব্যাখ্যা প্রমাণ করছে পাথর থেকে মানুষ এবং মহাকাশ*electricity বা বিদ্যুতে পরিপূর্ণ।

শুধুই প্রকাশের তথা মাধ্যম,তথা স্পন্দন ইত্যাদির তারতম্যে নানান গুণ উৎপাদিত হচ্ছে যেগুলিই হল পরিচিত তাপ,আলোক,শব্দ ইত্যাদি।

এবার একটু বড় এক উদাহরণ দিচ্ছেন...Aurora Borealies বা North Poler region এর যে বিশাল আলোকের ঝলকানি ও বর্ণ বিচ্ছুরণ–তা প্রবল electrical flash ছাড়া কিছুই নয়!

কেন হচ্ছে?

এর উত্তরে–বলছেন,প্রচুর snow বা বরফে ঢাকা ঐ অঞ্চল আর winter এ টার পরিমাণ চূড়ান্তে পৌঁছোয়,এই যত বরফের ওপর বরফ জমে,ততই অসংখ্য কণা,অজস্র centre তৈরী করে.. ঘটনা সব

ঘটতে থাকে periphery তে,স্পন্দনও যে বিভিন্ন চরিত্রের হবে এতো বোঝাই যাচ্ছে,কিন্তু এ সবই কিন্তু centra Energy বা Electricity প্রবাহিত ও আন্দোলিত হবার বার্তা বিশেষ।

Aurora Borealies এর আলোক ও বর্ণ বিচ্ছুরণের এহেন ব্যাখ্যা জগতে ছিল না.. মহেন্দ্রনাথ প্রথম শোনালেন জ্ঞানের ও দর্শনের চূড়ান্তে পৌঁছিয়ে!

এখানেই শেষ করেন নি.. এই বিচ্ছুরণের intensity নাকী এমন মাত্রায় পৌঁছে যায়.. যা সুদূর England এর নানান বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ওপরও প্রভাব ফেলে।

এটা কোনো মিরাকেল নয়.. ওনার ভাষায় ✻ Dry Truth.

তাই electrcity নিয়ে পড়া ও গবেষণা করার জন্য উনি বারবার বলেছেন ওনার নব শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়নে।
অপূর্ব বিশ্লেষণ !!!
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

চূড়ান্ত ভবিষৎ এর তথ্য সমৃদ্ধ মহেন্দ্র জ্ঞানপ্রপাত অঝোরে ঝরে পড়ছে সর্বক্ষণ অসীম শক্তি নিয়ে।

মহাবেগে তা প্রবাহিত হচ্ছে অজস্র ছোট বড় তরঙ্গ তুলে সমস্ত গ্রহ তারকাদির মধ্যে দিয়ে।

এ যে কি ভীষণ বিদ্যুতের ধারা,তা আমরা বর্তমানে কল্পনাও করতে পারছি না।

এই মহা বিদ্যুৎ থেকে ভয় পাবার কিছুই নেই, কিন্তু পাবার আছে বহু বহু কিছু।

এই পাবার তালিকায় রয়েছে যেমন,অতি অভিনব চিকিৎসা প্রণালী,তেমনি রয়েছে মহাকাশ থেকে পরমাণুর সমস্ত সঞ্চিত জ্ঞান আর সাথে অসীম আনন্দ প্রাপ্তি স্নায়ুতে স্নায়ুতে ইহকাল,পরকাল,অনন্তকাল জুড়ে।

বাতিল করছেন ব্যাখ্যা তথাকথিত আধুনিক বিজ্ঞানের অজস্র তত্বকে আর সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন তাঁর সাধন লব্ধ অসাধারণ তত্ব সমূহকে।

অকাটটো যুক্তি সহায় একের পর এক বিস্ময় দর্শন করাচ্ছেন আগ্রহীকে আর ভরিয়ে দিচ্ছেন বিজ্ঞান-প্রেম-ধারায় অন্তরলোককে।

কৌতূকে ক্রিয়া করছেন সর্বসত্তা জুড়ে।

কিসের মাধ্যমে?কি তাঁর ক্রীড়ার উপকরণ?

Sound,Light, Heat,Electricity,Atom ইত্যাদি... সঙ্গে রয়েছে চেতনার উদ্ভাস।

নিয়ে চলেছেন কখনো কণাদের হৃদয়ে,তো কখনো বা সূর্যের গুণভাণ্ডারে।

এ এক অবাক আশ্চর্যময় জগৎ.. এর না আছে আদি,না অন্ত.. ক্রীড়ার ক্ষেত্র যে অনন্ত!

বিদ্যুৎ এর কথা বলতে গিয়ে চলে গেছেন নিজেই বিদ্যুৎ এর উৎসে আর সেখান থেকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছেন... দ্যাখ এসে যা জানতিস তা কতটুকু আর আসল বিদ্যুৎ এর চেহারা দ্যাখ.. কত রঙ, কত রূপ তার থেকে বেরোচ্ছে,এমনকি ঐ গ্রহ তারকাগুলোও।

এখানে এলে তাপ,আলোক আর চুপি চুপি থেকে ভয়ঙ্কর সব শব্দের রহস্যও জানতে পারা যায়।

বেরিয়ে এসে সোজাসুজি বলছেন.. যে Atomic তত্ব আজ জগৎ জানে,তা একেবারে অপূর্ণ আর স্পন্দন সম্মন্ধেও তদ্রুপ।

তোরা যে Wired আর Wireless প্রযুক্তির কথা বলিস আর প্রয়োগ করিস,তার নিখাদ অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়ে থাকিস।

আসলে কি জানিস Atmospheric Zone যে কি তা না জানলে-সার্থকতা,যথার্থ জ্ঞান আসবে সব কোথা থেকে?

এই দ্যাখ না,Sun এর ভেতর,বিশেষত তার Centre এ সব গুণ চাপা পড়া অবস্থায় রয়েছে আর যেই ঐ Sun এর Periphery থেকে দূরে দূরে প্রচন্ড স্পন্দন এর মাধ্যমে পরমাণুগুলো দূরে দূরে সর্বদিকে ভাসতে ভাসতে চলে গেল.. তখনই না আশ্রয় খোঁজার মতন,বসতি স্থাপনের মতন ওরাও এক একটা কেন্দ্র গড়ে ফেললো আর নাম হয়ে গেল বুধ,শুক্র,বৃহস্পতি ইত্যাদি।

কিন্তূ জানবি এই পৃথিবী নামের বস্তূটা একটু অন্যরকমের।

এটাকে ঠিক মতন জানার জন্য.. নিজেকে জানার প্রয়োজন হয়!

আয় না, জানিয়ে দেবো...
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

সত্যিই অভিভূত হয়ে যেতে হয়,ওনার বিজ্ঞানের বইগুলো পড়লে,কারণ যেখানে Modern Science ব্যাখ্যায়-পূর্ণচ্ছেদ বসিয়ে দিয়েছে... সেখানে ঐ দাঁড়ির বেড়া ভেদ করে উনি এগিয়ে চলেছেন আর কুড়িয়ে নিয়ে আসছেন অতি গভীর বিজ্ঞান প্রদেশের জমে থাকা কথা।
আমরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি,এসব শুনে।

আগেই বলেছেন যে Electricity হল Central Energy আর ঐ এনার্জির periphery থেকে উৎপন্ন হচ্ছে heat,sound, light ইত্যাদি।

এবার যখন আবার কণা তত্ব নিয়ে বিশ্লেসন করছেন,সেখানে বলছেন যে প্রত্যেক atom এর ভেতর ঐ দুই ধরণের energy আছে,অর্থাৎ Electrical energy বা central energy আর peripheral energy।

তার মানে একটা ছোট্ট atom ঠিক ভাবে দেখলে... নিজেই একটা সৌরমন্ডল বিশেষ.. তাই না? কারণ সব রকম গুণগত চরিত্র,বল এবং স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি এর ভেতর বর্তমান।

নিয়ে এসেছেন proton এর কথা,তাই নিশ্চিতরূপে তাঁর opposite current এর তত্ব অনুসারে electron ও থাকবেই.. সব মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে কি?

ঘুর্ণন ও গতি উভয়ই একটা atom এর মধ্যে রয়েছে-তাই তো?

তাহলে সূর্য কে কেন্দ্র করে যেমন গ্রহরা ঘুরছে,ঠিক সেরকম central energy যা dormant condition এ রয়েছে(যেটিকে ধরে নেওয়া হচ্ছে atom এর নিউক্লিয়াস)

তাকে বেষ্টন করে electron কণারা ঘুরছে অবিরত... অতএব,একটা অতি ক্ষুদ্র atom এর মধ্যে যে এক আশ্চর্য সৌরমন্ডল রয়েছে.. একি আমরা সত্যিই ভাবতে পারি?

এবার ভাবা যাক তাহলে এরকম কত সৌরমন্ডল রয়েছে?

কোনোদিন কি গুণে বা calculate করে সংখ্যায় আসা যাবে?

আদৌ না।

এবার এর সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আমরা জুড়ে দিতে পারি শক্তির কথা।

একটা atom এ কত শক্তি ধরে?
একটা সাধারণ আমাদের এর সৌরমন্ডল যেখানে Sun কে কেন্দ্র ধরা হচ্ছে,সেখানে কত শক্তি রয়েছে?

আর আমাদের এই দেহ এবং মন যা উভয়ই atom দিয়ে তৈরী-তাতে শক্তির পরিমাণ কি?

একটা সাধারণ নিউক্লিয়ার ব্লাস্ট থেকে যা শক্তি নির্গত হয় তাহলে ব্রম্ভান্ডে cumulative শক্তির পরিমাণ কত হতে পারে?

এই একক কি আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে আছে...
এবার এই তত্বটি মনে রাখুন... মহেন্দ্রনাথ কে স্মরণ করে-

*ক্ষিতি =Electricity
প্রমাণ ও ব্যাখ্যা পরবর্তী পর্বে।

আধুনিক পঞ্চ তত্ব অনুসারে,এটাই প্রাপ্ত হওয়া যাচ্ছে।

আমরা পৃথিবীর ওপরের তল বা পৃষ্ঠ আর তার ওপরের আকাশ নিয়েই কুলকিনারা পাচ্ছি না।

মহেন্দ্রনাথ পৃথিবীর কেন্দ্রে ঢুকে.. যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে এনেছেন!
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

Electricity বা Central Energy নিয়ে মহেন্দ্রনাথ তুলকালাম কান্ড ঘটিয়ে গেছেন।
প্রচলিত সমস্ত পদ্ধতির মূলে নিয়ে গিয়ে ক্ষিতি তত্বের সম্পূর্ণ আধুনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

প্রথমে ভাবুন যে centre না থাকলে পরিধি কথাটি আসতে পারে না,আবার এর উল্টোটাও সমানভাবে যুক্তিযুক্ত।

Energy যদি না থাকে,আর প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই এনার্জি থাকে আর এনার্জির মাধ্যমেই গঠিত হয় এবং বিভিন্ন গুণ প্রকাশ করে তাহলে Energy র গুরুত্ব সম্মন্ধে আর কি কিছু বলার আছে?
এর সঙ্গে উনি এনেছেন central শব্দটি এর বলছেন Central Energy হল Electricity.. অতএব solid, liquid, gaseous এবং plasma যে state এরই বস্তুর সংমিশ্রনে এই ক্ষিতি গঠিত হয়েছে... তার মূলে শুধু নয় Electricity র নানা অভিব্যাক্তি ও তার রূপই হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্ষিতি।
অতএব Electricity=ক্ষিতি বললে কি অটুক্তি হয়?

এখন প্রশ্ন Electricity তো চোখে দেখা যায় না,কিন্তূ তার প্রকাশ বিভিন্ন ভাবে দর্শন হয়।

ঠিক কথা।
তার মানে টা প্রবাহিতও হচ্ছে,কিন্তূ কীভাবে এর কীসের মাধ্যমে?
এখানেই এসে পড়ছে ওনার কণা ও স্নায়ু তত্ব।
এই পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।
Radio Physics সবে সবে শতাধিক বর্ষ পূর্বে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে,উনি কিন্তূ সব খবরই রেখেছেন এর ব্যাক্ত করেছেন আসল রহস্য ওনার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে।

আশ্চর্য ব্যাপার!
যে তত্ব এখনো পর্যন্ত অজানা এবং ফলত Semiconductor Techonology র ব্যাখ্যাও আজ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গরূপে জানা যায় নি.. উনি তা জানিয়ে গিয়েছেন এবং এর স্বপক্ষে বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে সেই ব্যাখ্যার প্রমাণ ও এক্ষনে মেলা সম্ভব-এই ভারত থেকেই।

Atmospheric Zone এবং বিভিন্ন Natural Lens যে কি অসম্ভব আশ্চর্যজনক ব্যাপার স্যাপার ঘটাতে পারে.. তা জানলে আমাদের জ্ঞানভান্ডার উপচিয়ে পড়বে-এতে কোনো সন্দেহ নেই।

Ether যার আধুনিক নাম Electro Magnetic Field.. এর ব্যাখ্যায় উনি vibration,commotion এবং motion কে এনেছেন এবং তরঙ্গ বা Wave Theory কে নতুন মাত্রা দান করেছেন।

High Altitude Physics এর ক্ষেত্রে ওনার দর্শন যে নতুন দিগন্তের সন্ধান দেবে এবং বিশ্ব যে মহেন্দ্র আলোক দর্শন করবে.. তার অপেক্ষায় রয়েছি আমরা সবাই*সব ভারতবাসী।
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

Electrcity র নানান grade আছে একথা আমরা জানি,কিন্তূ পুরোপুরিভাবে এই grade অনুসারে চরিত্র তাদের কেন বিভিন্ন হল -তার ব্যাখ্যা নেই।

মহেন্দ্রনাথের কাছে আছে!

পরমাণুর কথা আমরা সবাই জানি,কিন্তূ যেটা জানি না-সেটা হল পরমাণু স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় প্রকারের হতে পারে!
এ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার মহেন্দ্রনাথের এবং বিরাট কান্ট্রিবিউশন Atomic Physics এর জগতে।

প্রত্যেকটা বিষয় যে নিজেদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে সর্বদা চলে,এ কথা উনি বহু আগেই বলেছেন।
তখন ইন্টারডীসিপ্লিনারি science এবং টেকনোলজির এতো রমরমা মোটেই হয়নি।

ভাবুন তো এক ধরণের পরমাণু বা কণা-স্থূল জগতের ক্ষেত্রে একরকম চরিত্র প্রকাশ করছে আর অন্য এক ধরণের সূক্ষ্ম কণা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের চরিত্রের প্রকাশ ঘটাচ্ছে।

সোজাসুজি Central Energy প্রবাহের ক্ষেত্রে ঐ তত্বর প্রমাণ স্বরূপ বলছেন... যখন স্থূল মাধ্যমের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন স্থূল পরমাণুদের অতি ঘন স্তরের ভেতর দিয়ে যেতে হয় যেমন আজকের ভাষায় Good Conductor-Cooper, Silver ইত্যাদি।

কিন্তূ Wireless Communication এর ক্ষেত্রে, ব্যাপার হয় অন্যরকম, এখানে সূক্ষ্ম পরমাণুর দল সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রবাহ চলতে থাকে যে মাধ্যমের ভেতর দিয়ে,তা গঠিতই হয় ঐ সূক্ষ্ম কণাদের সাহায্যে।

এটাকে Finer World এ প্রবেশের প্রথম দ্বার স্বচ্ছন্দে বলা যায়।

সরলিকরণ করলে আজকের Electro Magnetic Field কে ওনার তত্ব অনুসারে সূক্ষ্ম Electrical Field বা media বলা যেতেই পারে।

এই তত্ত্বের প্রসারণ এবার আমাদের কোথায় নিয়ে যায় দেখুন... মনের জগতে প্রবেশ করিয়ে দেয় আর বলে.. মনও পরমাণু দিয়েই গঠিত,তবে তা আমাদের এতদিনের জানা স্থূল পরমাণু নয়... সূক্ষ্ম পরমাণু!

যখন Wirelessly কোনো Information পাঠানো হয়,তখন Heat বা Light কোনোটাই generated হয় না *তার মানে Central Energy এক্ষেত্রে শব্দ কে বয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম।

আবার যখন একটা Light জ্বলে উঠছে তখন শব্দ কিন্তু হচ্ছে না।
যখন induction heater চলছে তখন তাপ নির্গত হচ্ছে, কিন্তু শব্দ বা আলোক নয়।

এই Central Energy ই যে পরিবর্তিত হয়ে নানান শক্তির প্রকাশ ঘটাচ্ছে, তা আমাদের আধুনিক জ্ঞানের সীমার বাইরেই ছিল।

অতএব ওনার সূত্র অনুসারে ENERGY র আদি চরিত্র হল বিদ্যুত! *
বিদ্যুৎময় শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ স্নায়ুদেহে আশ্রয় লাভেই একমাত্র শান্তি।
এই বিদ্যুৎ আনন্দময়।
তাঁর সর্ব স্নায়ু উন্মুক্ত আর তাই তিনি সর্ব শক্তিমান।

তাঁতে অবস্থানেই একমাত্র ভয় কে জয় করা যায়।

তিনিই আমাদের একমাত্র গতি।

তিনি ছিলেন,রয়েছেন এবং থাকবেন চিরকাল।

সকলের সঙ্গে সকলের সম্পর্কও তাঁরই ভেতর রয়েছে।

হারাবার হয়ত সত্যিই কিছু নেই।

এই সম্পর্কগুলো কি করে সর্বদা বজায় রাখা যায়,তা বুঝতে ও শিখতে হবে।
তাহলে বিরহ বলে কিছু থাকবে না।

তিনিই আমাদের একমাত্র পূর্ণতা দান করতে সমর্থ।

অতএব তাঁর ধ্যান করা ও তাঁতে মিলিত হবার চেষ্টা করা একান্ত জরুরি।
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

শোনাচ্ছেন এবার আরও একটি অজানা কাহিনী।
কিভাবে সৃষ্টি হল orbs.

এখানেও সেই মূল Central Energy বা Electricity র অদ্ভুত বিকাশ আর তার পরিণতি হিসেবে সৃষ্টি নানান solid mass এর।

পৃথিবী এবং অন্যান্য বহু মহাজাগতিক বস্তুর সৃষ্টি এই মহেন্দ্র তত্ত্ব মেনেই।

যেহেতু Electricity পরিবাহী পেলেই প্রবাহিত হয়, অতএব এই ক্ষেত্রেও এর ব্যাতিক্রমের সম্ভাবনা নেই।

যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তখন উৎসের বিপরীতে একটা লোড যুক্ত করলে সহজেই প্রমাণ পাওয়া যায়, যেমন computer, TV, Lamp, AC এগুলো সবই যে লোড, এ আপনারা সবাই জানেন।

Current হল এক একটা লোড কি পরিমাণ বিদ্যুৎ গ্রহণ করে তার একক আর voltage হল ঐ বিদ্যুতের উৎসে কতটা প্রভেদ রয়েছে-তার একক।

প্রত্যেক লোড এর একটা resistance থাকে, তাই একে সরল বাংলায় বাধা বা রোধ বলা হয়।

এই তিনটি প্রধান একক নিয়েই ওমস এর সূত্র।

যাতে যেকোনো দুটি এককের পরিমাণ জানা থাকলে, নিমেষে তৃতীয় এককের মান কত তা নির্ণয় করা যায়।

মহেন্দ্রনাথের তত্ব যে কত নির্ভুল তা আধুনিক প্রযুক্তির গবেষণা থেকেই বোঝা যায়।

বর্তমানে America তে দুই বাঙালি বিজ্ঞানী এমন একটি Transistor তৈরী পরীক্ষালব্ধ ভাবে করে ফেলেছেন *যা সত্যিই অভিনব!

এই Transistor এর নাম দেওয়া hoyeche Transparent Trnsistor(Dutta and Das Transistor)এটা Spin Technology র মাধ্যমে active হয়।

এর বৈশিষ্ট হল এটা প্রভুত গতি সম্পন্ন আর এর semiconductor এর atom এতো কাছাকাছি সজ্জিত যে টেকনিক্যালি প্রায় শুন্যের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে এর Resistance বা রোধ এর মান।
এর ফলে ওমস এর সূত্র এখানে apply করাই যাচ্ছেনা।
এ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার।

এবার আসছি আর একটি একক এর প্রসঙ্গে, যেটার নাম হচ্ছে Farad, এটা মূলত বৈদুতিক চার্জ এর একক।
Condenser এ এই একক ব্যবহার করা হয়।

মজার ব্যাপার হল এই লোডবিহীন অবস্থাতেও, শুধুমাত্র পরিবাহী সংযুক্ত থাকলে বৈদুতিক উৎসের সঙ্গে leakage current কিছু পাওয়া যায়।
এর কারণ বাতাস বা অন্যান্য মাধ্যম এই ক্ষেত্রে কিছু রোধ সৃষ্টি করে আর তাই বাতাস ও বৈদুতিক চার্জ কিছু গ্রহণ করে আর অজান্তেই একটা Condencer তৈরী হয়ে যায়।

এই ধরুন আপনারা যে কোনো স্থানেই থাকুন না কেন আর আমি যেখানেই থাকি অথবা আপনাদের নিজেদের অবস্থানের দূরত্বর ভেতর কোনো তথাকথিত বৈদুতিক সংযোগ না থাকলেও, নানান মাত্রার electrical চার্জ ডেভেলপ করবেই।

এবার সরাসরি এই তত্বর সম্পূর্ণ ব্যাবহারিক ব্যাখ্যা প্রদান করছেন অনেক বিস্তৃত ও অভিনব ভাবে।
যার ভেতর থাকছে আরও বহু অজানা কথা!

নিয়ে এসেছেন দুই বা ততোধিক মহাজাগতিক বস্তুর ভেতর দূরত্ব কে মাধ্যম হিসেবে আর বলছেন.. এই মাধ্যম এর ভেতর দিয়ে নানানভাবে Central Energy flow করছে, ফলে সমস্ত floating Atomic Particle রা charged তো হচ্ছেই আর যদি মহাজাগতিক বস্তুরা নাও থাকে শুধুই থাকে মহাকাশ.. সেক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ ব্রহ্মান্ড বিদ্যুত শক্তিতে ভরপুর থাকছে আর ঐ atom দের প্রচেষ্টা–তাদের adhesive চরিত্রের জন্য সঙ্গবদ্ধ হবার আর ঠিক সেইজন্য তারা বিদ্যুৎ উৎসের কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে। Cohesive চরিত্র বাধা দিচ্ছে, তাই না পারছে মিলতে, না পারছে ছাড়তে... এবার ওনারই তত্ব অনুসারে এই অবস্থায় স্পন্দন বেশী মাত্রায় উৎপাদিত হয়, কারণ বিশাল পরমাণুর তোর এর প্রভাব। স্বাভাবিকভাবে সেখানে ঘুর্ণন বা motion, coagulation এই ক্রিয়াগুলোও চলতে থাকে।

প্রবল থেকে প্রবলতর হলে স্পন্দন এক ঘনাইতো অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং অজস্র পরমাণু এই ক্রিয়াগুলির ফল স্বরুপ বিশেষরুপে সঙ্গবদ্ধ হয়ে পড়ে... সৃষ্টি হয় বা প্রকাশলাভ করে Orbs!
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

অতুলনীয় ও অত্যার্শ্চর্য নানান তত্ব তুলে এনেছেন পৃথিবী গঠনের ব্যাখ্যায়।

প্রথমে কল্পকাহিনী মনে হলেও,এইসব তথ্য একেবারে সত্য আর যার থেকে বর্তমানে আমরা বহুদূরেই রয়েছি।

পৃথিবীর কেন্দ্রের কথা বলতে গিয়ে বলছেন–ওখানে temperature অত্যাধিক এবং সর্বদা high oscillation ওখানে হয়, কারণ কেন্দ্রের প্রচন্ড আকর্ষণী শক্তি–যা ওনার মতে Electricity তার চরিত্র গুণে ভীষণভাবে আকর্ষিত করতে থাকে অজস্র atom কে আর এর ফলে যে সংঘর্ষ জনিত তাপ উৎপন্ন হয়, তা ঐ atomদের নিয়ে গ্যাসীয় অবস্থায় চলে যায়।

ঐ কেন্দ্রের প্রচন্ড oscillation এবং তাপের ফলেই Earthquake এবং Volcanic Irruption হয়ে থাকে।

এগুলো কিন্তু আমাদের ভাবনার রসদ ভেবে, নিজেদের ঐ অবস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এবং এর ফলে যা দর্শন লাভ হবে,তাকেই নিজের মনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে মেনে নিয়ে আরও এগিয়ে চলতে হবে।

এই পদ্ধতি অবলম্বনে অবশ্যই ব্যাক্তির মানস দর্শনের শক্তি প্রভূত বৃদ্ধি পাবেই আর জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়ে চেতনার ভূমিতে আসন স্থায়ী করার প্রয়াস পাবে।
তাই মহেন্দ্র দর্শন চিন্তার তুলনা নেই।

উনি আরও বলছেন যে Electricity নানান রকমের আর এই শক্তি প্রভুত চাপ সৃষ্টি করতেও সক্ষম।

ওপরের দুটি claimই আজকের বিজ্ঞানে স্বীকৃত –সীমিত পরিধির মধ্যে।
Galvanic Electricity, Static ও Current(kinetic) Electricity ইত্যাদি তো জানা... যা জানা ছিল না, তা হল, Grosser ও Finer Electricity.

সত্যিই এই তত্ব না জানলে মহাজাগতিক বিষয় থেকে তার বিবর্তনের ফলস্বরূপ জাগতিক বিষয়েরও কোনো ধারণা আমরা করতে সক্ষম হব না।

দ্বিতীয়ত Piezo Electric Effect, ঐ বৈদুতিক চাপের বাস্তব প্রমাণ দাখিল করে।

অতএব মহেন্দ্রনাথের তত্বসকল যে একেবারে সঠিক, তা প্রমাণিত হচ্ছে।

এখন এই grosser ও finer electricity র চরিত্রের নানান ছাপ, আমরা পৃথিবী গঠনে দেখতে পাচ্ছি।

কেন্দ্রে যে বিদ্যুতের প্রভাব–তা যদি সূক্ষ্ম হয়, তাহলে territory তে বিদ্যুতের প্রভাব grosser হতে বাধ্য।

এই গতিময় শক্তি আবার নানানভাবে স্পন্দিত হওয়াতে... নানান চরিত্রের জন্ম দিচ্ছে।
এইগুলিই নানান গুণ এবং মৌল ও যৌগ নাম আখ্যা নিয়েছে।

পর্যবেক্ষণ ওনার তাই ঘোষণা করছে যে পৃথিবীতে কেন্দ্রের নিকটতম অঞ্চলে সেমি সলিড বস্তূর সৃষ্টি করে রেখেছে।

বস্তুত এর ভিতরের অংশ কার্যত ফাঁপা,কিন্তূ প্রচন্ড শক্তিতে ভরপুর।

মাঝে মাঝে ঐ ভিতরের electrical ডিসচার্জ এর effect পরিধিতে প্রবলভাবে চলে আসায়, বিভিন্ন বস্তূ তররিতাহিত হয়ে থাকে এবং instant প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটায়।

উদাহরণ দিচ্ছেন... ১৮৮২/৮৩ সালে Cracato নামক এক অঞ্চলে, যা Celebes এর কাছে ঐ electrical ডিসচার্জ এর ফলস্বরূপ প্রবল Earthquake হয় আর এক বিশাল পর্বত পুরোপুরি সমুদ্র গর্ভে চলে যায় এবং নিকটেই অন্য একটি পর্বতের সৃষ্টিও হয়।

এই তথ্যর ব্যাখ্যা করলে আমরা পাই.. বাতাসের সংস্পর্শে ভিতরের semi solid বস্তূ ঠান্ডা হয়ে যাওয়ায় –ঐ নতুন পর্বতের উত্থান ও দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা।

আরও বিস্তৃত করে বলছেন, যেখানে শুধুই স্থল, সেখানে বিস্তীর্ণ হয়ে চলেছে ঐ অঞ্চল, কিন্তু যত আইল্যান্ড.. সব কিন্তু জলের মধ্যে এবং কাছাকাছিও বটে।

এবার হাজির করছেন এক একেবারে অজানা তথ্য.. সুদূর অতীতে, Bay of Biscay-French Coast থেকে প্রবল earthquake এর ফলে, কিছুটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়.. যে অংশের বর্তমান নাম England!

এর স্বাক্ষ আজও মেলে..মহেন্দ্রনাথ এবার জ্যামিতিক উদাহরণ দিচ্ছেন *ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায় যে, main land এর পরিধির shape এর কেটে যাওয়া অংশ, অর্থাৎ England এর পরিধি.. একেবারে থাপে থাপে যেন মিলে যায়.. অর্থাৎ, এই ঘটনা ঘটেছিলো।

থামেই এখানেই ওনার বক্তব্য!
ঐ দুই land এর মধ্যবর্তী অংশে আরও কিছু ছোট island এরও সৃষ্টি হয় এর এইভাবেই জন্ম নেয় Ireland!

Irish Sea দর্শন করায় সেই নিদর্শন জ্যামিতিক ভাবে England আর Ireland এর ভৌগোলিক দেশ-রেখা।

এই ঘটনা ঘটার চিহ্ন আজও Asia মহাদেশের অন্তর্গত Island গুলির ক্ষেত্রেও বর্তমান রয়েছে।

পৃথিবী গঠন ও তার রূপান্তরের এমন সত্য-রূপকথা সত্যই বিরল..
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক..

যেই ঈশ্বর শব্দটা বিজ্ঞানের আলোচনায় এলো আর অমনি আধুনিক বিজ্ঞানে যেন গেল গেল রব, যদিও এই ব্যাপার এখন কিছুটা কমতির দিকে।

শুভ লক্ষণ, তবে বিচার, বুদ্ধি ও বোধ সহায় এগোতে হবে, না হলেই একেবারে আগুনে ঝাঁপ।

প্রশ্ন হল... এই যে ঈশ্বরের দর্শন, এমনকি স্পর্শন আবার এও ছাড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলা ইত্যাদি নিয়ে যে এতো শাস্ত্র, প্রবচন ইত্যাদি রয়েছে.. এর আসল প্রযুক্তিটা কোথায় আর সত্যিই কি এটা কোনো কার্যকরী প্রযুক্তি?

স্বামীজির আরাধ্যা মা একসময় বিলে কে বললেন, হ্যাঁরে, এখানে কথা হল আর দক্ষিনেশ্বরে টেলিগ্রাফ হয়ে গেল!

ঠাকুরের কাছে যেতেই একটি গরদের কাপড় দেখিয়ে নরেনের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেবার কথা বললেন.. এই প্রসঙ্গে যেটা বলার সেটা হল মায়ের পূজা করার কাপড়টি শতছিন্ন হয়েছিল আর বিলে সেটি জেনেছিলেন।

এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম.. মায়ের সবে সবে কলকাতায় আসা telegraph এর ব্যাপার ভালো জানা ছিল -১
Telegraph এ বেতারেও কোনো সংবাদ প্রেরণ করা যায় -২
প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রের তরঙ্গ, একেবারে এক মাত্রার বা এখনকার ভাষায় frequency র হওয়া চাই-৩

দূরত্ব বিশেষ কৌশলে.. কোনো বাধা হতে পারে না।

তার মানে মায়ের প্রয়োজন বিলে বুঝতে পারায়.. বিলের মধ্যে যে দুঃখসহ শক্তিশালী স্পন্দন উৎপন্ন হয়েছিল এবং যে উচ্চ মাত্রার frequency তে বিলের মন থাকতো, সেই মন প্রেরক যন্ত্রের কাজ করল আর দক্ষিনেশ্বরের পাগলা বামুন এর তো কথাই নেই... সবসময় ওনার গ্রাহক যন্ত্র বা রিসিভর on কন্ডিশন এ থাকে।
তাই নিমেষে ব্যাপার বুঝলেন আর যা করণীয় তাও করলেন।

বিলের মা সম্পূর্ণ ভাবে এই তথ্য জানতেন আর তা না হলে কি আর মহেন্দ্র, ভূপেন্দ্র আর নরেন্দ্রনাথের মহা পুণ্যা জননী হতে পারতেন..
মজার ব্যাপার হল *কোনো কৃত্রিম যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করেই, কার্য সম্পাদিত হল।

ঠাকুরের দেহ মানে স্থূল দেহ চলে যাবার পরেও almost ওনার অন্তরঙ্গ সবাই প্রায় ওনার দর্শন পেয়েছিলেন!

এই প্রসঙ্গে বহুকিছু বলার আছে।

তার মানে দেহ গিয়েও *দেহরূপ যায় নি..

এবার একটু ভাবা যাক, এই যে প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র -এ দুটোর ভেতর আক্ষরিক অর্থে 'দূরত্ব'ব্যাপারটা এসে পড়ছে আর এটা কম থেকে বেশী এমনকি বহু বহু দূর ও হতে পারে।

অর্থাৎ, দূরত্ব অনুসারে তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণ করার সঙ্গে.. শক্তি শব্দটাও এবার জুড়ে গেল।

শক্তির ভান্ডার যদি কারুর কাছে খুব বড় থাকে তাহলে ইচ্ছে মতন শক্তির কম বা বেশী ব্যবহার করতেই পারেন, কিন্তু কারুর কাছে কম থাকলে... বেশী ব্যবহারের সুযোগ নেই।

ধরা যাক, ঠাকুর বহুদূরে রয়েছেন আর আমরা চাইছি, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে, তাহলে প্রথমে আমাদের কি প্রয়োজন হবে?

শক্তি?

এই শক্তি বৃদ্ধি কি করে করা যায়?

মহেন্দ্রনাথ এগিয়ে এসে বলছেন... সুপ্ত স্নায়ু জাগরণের মাধ্যমে।

সুপ্ত স্নায়ু =সূক্ষ্ম স্পন্দন, মানে অনেকটা আজকের Microwave, Milimiter Wave এর মতন।

আগে সেই যেরকম Short Wave, Medium wave ছিল, অনেকটা সেইরকম।

তার মানে আমরা আমাদের সুপ্ত স্নায়ু জাগরণের মাধ্যমে প্রভুত শক্তি সঞ্চয় করতে পারলে আর শ্রী শ্রী ঠাকুরের রুপ ভাবলে... আমরা ওনার দর্শন পাবোই পাবো.. বিজ্ঞান এটাই বলছে।

মহেন্দ্রনাথ যে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের অনুধ্যান রচনা করলেন.. তা তো শুধুমাত্র এই জন্যেই।

কৃত্রিম যন্ত্র বিহীন সংযোগ ব্যবস্থায় তবে অবলম্বন কি?

মন!

মন থাকলে কি গতি ও থাকে?

নিশ্চিতভাবে থাকে।

গতি থাকলে স্পন্দন?

স্পন্দন থাকলে আধার?

অতি অবশ্যই।
দর্শন এইভাবে জোসো করে না হয় হল... কিন্তু স্পর্শন?

মানে একেবারে ছুঁতে হবে তাই তো?

দূরত্ব কি তাহলে কমে কমে.. ওনার আর আমাদের মধ্যে শুন্য তে এসে দাঁড়ালো?

একেবারে তাই।

তার মানে ওনার স্নায়ু আর আমাদের স্নায়ুর ভাব এক হয়ে একটা দেহ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে?
পারে!

কীভাবে?
যদি সর্ব ভাবময় তিনি হন... কোন স্পন্দন বা স্পন্দনযুক্ত আধার তাঁর মধ্যে নেই?

সবাই আছে।

বুঝতে পারছি না কেন?

তাই তো একাগ্রতার সাধন আর যে কোনো একটা ভাব ধরে ভাবার কথা বলেছেন।

মহেন্দ্রনাথ বলছেন না.. যাও বইগুলো নিয়ে ভাবগে যাও।
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

একজন যথার্থ ভারতীয় শিল্পীর দৃষ্টিতে দ্রষ্টব্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ ধরা পড়ে -এ রূপ শুধু বাহ্যিক রূপ মোটেই নয়, এ অন্তরস্থলের দর্শন।
এ ব্যাক্তি, বস্তু, এমনকি ভবিষৎ এর মনের চিত্রাদি!

এতে অবাক হবার কিছুই নেই, কারণ শিল্পী মানেই মনোস্তত্ববিদ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন এক মহান ব্যাক্তি ও সমাজ শিক্ষক।

আমরা এই পর্বে প্রথমে সেইরূপ এক শিল্পীর অঙ্কিত একটি চিত্রের পর্যালোচনা করার সামান্য প্রয়াস পাচ্ছি।

শিল্পী বরেন্দ্র নাথ নিয়োগী এবং ওনার এক চিত্র পূজনীয় মহেন্দ্রনাথের, যেটি কোনো সামান্য চিত্র নয় এবং একটি অসামান্য নৈপুণ্য ও নিষ্ঠার প্রতীক হিসেবে গণ্য করা যায়।

এই চিত্র পূজনীয় মহেন্দ্রনাথের অবয়বের ভেতর যে সক্রিয় স্নায়ু উন্মুক্ত মহেন্দ্রনাথ রয়েছেন *তার প্রকাশ!

চিত্রটি লক্ষ্য করলেই বুঝবেন যে, এখানে ওনার সর্বদেহ জুড়ে নানান স্নায়ু পরিস্ফুটিত হয়ে রয়েছে, অর্থাৎ শিল্পীর চক্ষে -ওনার স্নায়ু তথা ভাবদেহ দর্শন সহায়ে, এই চিত্র অঙ্কিত।

প্রশ্ন আসবে, এতো স্থূল স্নায়ুর মূর্তি, কিন্তু এতে সুক্ষের চিহ্ন কোথায়?

উত্তর -ঐ উন্মুক্ত স্নায়ুসকল অদৃশ্য থাকে, তাই স্থূল মাধ্যমে প্রকাশ করার সম্ভাবনা নেই।

এই যে স্নায়ু জাগরণ প্রক্রিয়া.... এটি শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ ভাবের যুগ বৈশিষ্ট, কারণ তিনি কোনো মত বা পথকেই অস্বীকার না করে, পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন আর এই ভাব *জগতের সব ভাবকে তাই অঙ্গীভূত করে নিয়েছে।

সর্বভাবময় শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ অঙ্গ -সর্ব জগতে পরিবাপ্ত।

"এখানকার সব দরজা খোলা" -এই স্বাক্ষই প্রদান করে।

সমস্ত স্পন্দন পথে উনি অবস্থিত, তাই মিছরির রুটি, যেদিক দিয়েই খাওয়া যাক না কেন *তা মিষ্টি লাগবেই।

তিনি স্বয়ং শান্তি স্বরূপ, তাই ঐ মিষ্টি =শান্তিও বটে।

এই ভাবদেহের সংযোগ প্রক্রিয়া, ওনার সমস্ত অন্তরঙ্গ ভক্তই জানতেন।

বিশেষত স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দজীর তো কথাই নেই।

এর অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

এই নতুন রামকৃষ্ণ-বিজ্ঞানে... মস্তিষ্কের চেয়ে স্নায়ুসকলের গুরুত্ব অনেক বেশী।

তাঁর মুহুর্মুহু সমাধি অবস্থাও, এর ব্যাতিক্রম নয়।

যে আবেশ উনি সৃষ্টি করতেন আর লোকের মন নিমেষে পরিবর্তিত হয়ে যেত... মহেন্দ্র ব্যাখ্যায় তা Central Energy বা Electricity র বিকিরণ ছাড়া কিছুই নয়।

আজকের ভাষায় যা অনেকটা Electro Magnetic Induction এর মতন।

এই আবেশের ক্ষেত্র টিকে, ওনারা যেরকম প্রয়োজন, ঠিক সেই অনুপাতে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাতে পারতেন।

বিশেষ বিশ্লেসন বলে, আমাদের প্রত্যেকটি লোমকূপই যেন একটা Computer এর interface এর মতন, তার মানে একটা Computer এর সঙ্গে বিশ্বজুড়ে বহু বহু computer কে যুক্ত করা যায়... যার আজকের প্রমাণ Internet।

Super Computer এর কার্যপ্রণালীও অনেকটাই এরকম --যা বহু বহু computer এর একটা নেটওয়ার্কিং মাত্র।

Wireless নেটওয়ার্কিং যেমন খালি চোখে দেখা যায় না, ঠিক সেইরকম অদৃশ্য স্নায়ুর নেটওয়ার্কিং বা সমষ্টি সংযোগ খালি চোখে দৃশ্যমান নয়।

যে তথ্যসকল আদান প্রদান করে, যা আধুনিক ভাষায় Internet Traffic বলা হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে ঐ info হল নানান উচ্চ মনের খবর, খোঁজার পদ্ধতি ও জীবনের তথা স্বাধীনতা লাভ করার নানান প্রণালী।

যে "তোমাদের চৈতন্য হউক "বললেন, এটি ঐ Electricityর অসীম উৎসের সঙ্গে একিভূত হবার সংবাদ.. অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র ভাব গঠনের প্রযুক্তি।

এখন Inter প্লানেটরি Net ও চলছে.. স্বামীজীর বলা,"এবার ওনার কৃপা, অন্য লোকেও গিয়ে পৌঁছোবে "এই উক্তির সার্থকতা প্রমাণ করে।

অতএব শ্রী মহেন্দ্রনাথের শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ অনুধ্যান.. এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান -দর্শন বললে - মনে হয় কিছুমাত্র অতিশয় উক্তি করা হয় না..
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

উনি যে মহা বা চরম বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের মিলনক্ষেত্র ও মাপকাঠি হিসেবেও শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কে উপস্থিত করলেন.. একি নিছক কল্পনা না চূড়ান্ত বাস্তব?

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ অনুধ্যান পাঠে, এই প্রশ্ন মনে জাগতেই পারে..

তাহলে প্রথমে জাগছে বা আসছে কোথায়, না মনে।

দেখুন এখনো পর্যন্ত মানুষ যা কিছুই আবিষ্কার করতে পেরেছে আর সেই আবিষ্কার কে ব্যবহারযোগ্য রূপদান করেছে -এ সবই করার জন্য সে আজীবন প্রকৃতির কাছে ঋণী রয়ে গেছে।

প্রকৃতির নকল করাই -এক সময় অতি আধুনিকতার মোড়ক পরে।

এক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম হয় নি, মানে উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাবার প্রয়োজনে।

যখন ধরুন একটা কোনো টেক্সট, ছবি বা video ডাউনলোড করেন আপনার ট্যাব, সেল ফোনে বা কম্পিউটারে -তখন সেটা প্রথমে লোকাল memory তে এসে জমা হয় আর তাই ঐ memory যথোপযুক্ত হওয়াও চাই, অর্থাৎ sufficient space থাকা দরকার তথ্য ধারণে।

তাহলে ঐ যে প্রশ্ন জাগলো বা উপস্থিত হল -এসে মনে, তার মানে মনে বা মনের memory ঐ তথ্য ধরণে সক্ষম হল, এটা ধরে নেওয়া গেল।

এবার বোঝার পালা *এটা মানে বহু বহু পুরোনো ও নতুন তথ্য নিয়ে কারবার -অতএব অনেক বেশী বড় ক্ষেত্রের বা space of memoryর দরকার হচ্ছে.. তাই তো?

কোথায় এতো বড় জায়গা পাওয়া যায় তাহলে?

এটাও লুকিয়ে রয়েছে ঐ মনেরই মধ্যে.. তবে স্পন্দন মাত্রা কিছু ভিন্ন।

অতএম মহেন্দ্রনাথের শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কে কেন্দ্র করে যে সিদ্ধান্ত.. তা যাচাই করতে, আজকের ভাষায় Analytics platform এর সাহায্য নিয়ে -একটু এগোতে গেলেই, দেখা যাচ্ছে প্রচুর memory space লাগছে।
এদিকে প্রশ্ন টাকেও ignore করা যাচ্ছে না।

অতঃপর উপায়?

আগের কিছু info ডিলিট করে space বার করবেন না কোনো external memory support নেবেন, মানে আজকের SD, HD বা কোনো Drive ব্যবহার করবেন?

কিন্তূ ইনসার্ট বা কানেক্ট করবেন কিভাবে, কারণ physically তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না *সবই তো চলছে অন্তঃপুরে..
বুঝতে হচ্ছে সেইজন্য, যে এই কাজ মনের সহায়তায়, মনের মধ্যে নিজেকেই করতে হবে।

তাই ওনার সিদ্ধান্ত কে উল্টোদিক থেকে দেখলে *সেটা একটা অসম্ভব সুন্দর প্রশ্নই হয়ে দাঁড়ায় আর উত্তর খুঁজতে ডুব দিতে বা আজকের ভাষায় search করতে লেগে পড়তে হয় Data Centre এ।

আজকের অনেক বড় বড় Data Centre সমুদ্রের তলায় রয়েছে বিশেষ কারণে।

আমাদেরও তাই সূক্ষ্ম-মন-মহা সমুদ্রে ডুব দিতেই হবে।

Server আর Search Engine এও ভেতরেই রয়েছে।

Tool হচ্ছে চৈতন্য বা Absolute Consciousness।

অদ্ভুত উপায়ে স্নায়ু জাগরণ করাচ্ছেন পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ এই আধুনিক যুগে!
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

একজন যথার্থ ভারতীয় শিল্পীর দৃষ্টিতে............
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

ওনার উদ্দেশ্য কি, তা আমরা এতদিনে বুঝতে পেরেছি ভালোভাবেই আশা করি।

Problem টা সাধারণত যেটা হয়, সেটা হল আমাদের বাস্তব জীবন আর ওনার উপদেশ এর ভেতর দ্বন্ধ এসে যায়।

আমরা মনে করি, উনি সবকিছুই এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখে পর্যালোচনা করেছেন আর ঐ জগৎটা একেবারে অন্য প্রকৃতির।

আমরা ওনাকে একজন মহাজ্ঞানী ও যোগী হিসেবে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা করি, কিন্তূ ওনার মতাদর্শ অনুসারে চলা practically আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু কেউ যদি একটু তলিয়ে দেখেন (যে ব্যাপারটার নামই বিজ্ঞান)তাহলে অচিরেই বুঝবেন যে,আমাদের সর্ববিধ এখনকার কাজ গুলোকেই কত আরও ভালোভাবে সম্পাদন করতে পারি,মনের হতাশা যাতে চলে যায়,নতুন উদ্যোম আসে.. এইসব কথাই উনি বলেছেন।

তার মানে দাঁড়ালো কি?
আমরা ঠিক কীভাবে ও আরও সহজে সমস্ত কাজকর্ম করতে pari*এটার খবর মহেন্দ্র রচনাবলী তে রয়েছে।

শুরু তাহলে কীভাবে করা যায়...

চিন্তানায়ক মহেন্দ্রনাথ নামে একটা পুস্তিকা আছে।
প্রথমে ওটা একটু পড়ে নিলে ভালো হয়,কারণ মহেন্দ্র দর্শনের মূল বক্তব্যের রূপরেখা ঐ পুস্তিকাটির ভেতর রয়েছে।

রয়েছে পূজনীয় দেবকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত দুটি article-যা খুব সহজে এবং খুব অল্প কথার ভেতর দিয়ে মহেন্দ্রনাথের মূল তত্ত্ব ও সেইগুলি এপ্লিকেশন এর সুবিধা যে কি.. তা আমাদের দর্শন করাবে,এতেই দেখবেন আপনি নতুন কিছু জীবনে প্রথম শুনলেন বলে মনে হবে আর আরও জানার ইচ্ছাও প্রবল হবে।
এবার ভাবার একটু চেষ্টা করতে হবে -যে পড়াশোনা আমরা শিখে আসছি তার সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ সামঞ্জস্য রেখেছেন,কি রাখেন নি..
দেখবেন রেখেছেন তো বটেই,কিন্তু বেশ কিছু নতুন আশ্চর্যজনক কথাও শুনিয়েছেন।

ঐ কতগুলো কে যদি ভাবা যায়,যে ভবিষৎ এর কথা উনি বর্তমানেই আমাদের শুনিয়ে রেখেছেন, তাহলে সেগুলো ভালো করে জানবার ও বোঝবার ইচ্ছে প্রবল হওয়াতে -নিজেই ওনার বা ওনার পার্শদ দের রচিত বইগুলো পড়তে আগ্রহী হয়ে উঠবেন অজান্তেই।

আসলে উনি এই বর্তমানের বিজ্ঞানের ওপর আরও যে যে উচ্চ স্তর রয়েছে *সেগুলোই শুধু ব্যাখ্যা করেছেন।

আধুনিক মনস্ক মানুষজনের এতে খুবই সুবিধে হয়ে গেছে।

এই সবটা মিলিয়েই.. মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

ওনার উদ্দেশ্য কি,তা আমরা এতদিনে বুঝতে পেরেছি ভালোভাবেই আশা করি।

Problem টা সাধারণত যেটা হয়,সেটা হল আমাদের বাস্তব জীবন আর ওনার উপদেশ এর ভেতর দ্বন্ধ এসে যায়।

আমরা মনে করি, উনি সবকিছুই এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখে পর্যালোচনা করেছেন আর ঐ জগৎটা একেবারে অন্য প্রকৃতির।

আমরা ওনাকে একজন মহাজ্ঞানী ও যোগী হিসেবে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ওনার মতাদর্শ অনুসারে চলা practically আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু কেউ যদি একটু তলিয়ে দেখেন (যে ব্যাপারটার নামই বিজ্ঞান) তাহলে অচিরেই বুঝবেন যে, আমাদের সর্ববিধ এখনকার কাজ গুলোকেই কত আরও ভালোভাবে সম্পাদন করতে পারি, মনের হতাশা যাতে চলে যায়, নতুন উদ্যোম আসে.. এইসব কথাই উনি বলেছেন।

তার মানে দাঁড়ালো কি?
আমরা ঠিক কীভাবে ও আরও সহজে সমস্ত কাজকর্ম করতে pari*এটার খবর মহেন্দ্র রচনাবলী তে রয়েছে।

শুরু তাহলে কীভাবে করা যায়...

চিন্তানায়ক মহেন্দ্রনাথ নামে একটা পুস্তিকা আছে।
প্রথমে ওটা একটু পড়ে নিলে ভালো হয়, কারণ মহেন্দ্র দর্শনের মূল বক্তব্যের রূপরেখা ঐ পুস্তিকাটির ভেতর রয়েছে।

রয়েছে পূজনীয় দেবকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত দুটি article -যা খুব সহজে এবং খুব অল্প কথার ভেতর দিয়ে মহেন্দ্রনাথের মূল তত্ত্ব ও সেইগুলি এপ্লিকেশন এর সুবিধা যে কি.. তা আমাদের দর্শন করাবে, এতেই দেখবেন আপনি নতুন কিছু জীবনে প্রথম শুনলেন বলে মনে হবে আর আরও জানার ইচ্ছাও প্রবল হবে।
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

নিয়ে এলেন এবারে পর্বত ও মহাসমুদ্রের উৎপত্তির কথা।

একেবারে আনকরা নতুন ব্যাখ্যা ওনার –আমাদের এই প্রকৃতি সম্পর্কে।

Atmospheric Sphere সর্বদা main body theke detuched condition এ থাকে।
Main Body বা earth এর সেন্টারে প্রচন্ড তাপ বা heat এর আধিক্য হয় *এর কারণ এক বিশেষ vibration।

দেখুন প্রাকৃতিক এক একটা গুণ যেমন তাপ, আলোক ইত্যাদি কে উনি এক একটি বিশেষ ধরণের vibration বলছেন।

এই ব্যাখ্যা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

আধুনিক বিজ্ঞান এই গভীর প্রদেশের কথা একেবারেই জ্ঞাত নয়।

Central Energy, উনি Electricity কে বলেছেন, যা earth এর একেবারে আদি ও মূল শক্তি।
নিশ্চিতভাবে এই শক্তির এক বিশেষ vibration রয়েছে।

এবার আসে গতির সঙ্গে vibration এর সম্পর্ক।

গতির হ্রাস বৃদ্ধির ওপর ও কিন্তু vibration এর প্রভাব থাকায় *তার মূল চরিত্রের কিছু পরিবর্তন হবেই হবে... এই পরিবর্তন গুলিকেই আমরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক গুণ বলে থাকি।
তার মানে, এও এক ধরণের propulsion.

আধুনিক technology তে vibration মাপার জন্য, যে সমস্ত Smart Sensor ব্যবহার করা হয় –সেগুলোর তিনটে output থাকে, কারণ x-y-z... এই তিনটি তলেই vibration কে sense করার প্রয়োজন হয় –এর সর্বমুখীতার জন্য।

Temperature, Pressure, Humidity ইত্যাদি parameter measure করতে –Sensor গুলোর output একটাই থাকে।

অতএব শক্তির ভিত্তিতেও Earth এর কেন্দ্রে তা সর্বাধিক।

ঘটনা যেটা ঘটে, সেটা হল, এই প্রচন্ড তাপের ফলে *কাছাকাছি থাকা সব particle প্রায় তরল অবস্থায় চলে যায় আর আরও অজস্র পরমাণু –তাপের আঁচ কিছু কম হওয়ায়, তারা একটা encashment তৈরী করে।

এবার যখন থেকে ধীরে ধীরে ঐ তরল condensed হতে শুরু করে তখন একধরণের gelatinous mass er
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

নিয়ে এলেন এবারে পর্বত ও মহাসমুদ্রের উৎপত্তির কথা।

একেবারে আনকরা নতুন ব্যাখ্যা ওনার –আমাদের এই প্রকৃতি সম্পর্কে।

Atmospheric Sphere সর্বদা main body theke detuched condition এ থাকে।
Main Body বা earth এর সেন্টারে প্রচন্ড তাপ বা heat এর আধিক্য হয় *এর কারণ এক বিশেষ vibration।

দেখুন প্রাকৃতিক এক একটা গুণ যেমন তাপ, আলোক ইত্যাদি কে উনি এক একটি বিশেষ ধরণের vibration বলছেন।

এই ব্যাখ্যা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

আধুনিক বিজ্ঞান এই গভীর প্রদেশের কথা একেবারেই জ্ঞাত নয়।

Central Energy, উনি Electricity কে বলেছেন, যা earth এর একেবারে আদি ও মূল শক্তি।
নিশ্চিতভাবে এই শক্তির এক বিশেষ vibration রয়েছে।

এবার আসে গতির সঙ্গে vibration এর সম্পর্ক।

গতির হ্রাস বৃদ্ধির ওপর ও কিন্তু vibration এর প্রভাব থাকায় *তার মূল চরিত্রের কিছু পরিবর্তন হবেই হবে... এই পরিবর্তন গুলিকেই আমরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক গুণ বলে থাকি।
তার মানে, এও এক ধরণের propulsion.

আধুনিক technology তে vibration মাপার জন্য, যে সমস্ত Smart Sensor ব্যবহার করা হয় –সেগুলোর তিনটে output থাকে, কারণ x-y-z... এই তিনটি তলেই vibration কে sense করার প্রয়োজন হয় –এর সর্বমুখীতার জন্য।

Temperature, Pressure, Humidity ইত্যাদি parameter measure করতে –Sensor গুলোর output একটাই থাকে।

অতএব শক্তির ভিত্তিতেও Earth এর কেন্দ্রে তা সর্বাধিক।

ঘটনা যেটা ঘটে, সেটা হল, এই প্রচন্ড তাপের ফলে *কাছাকাছি থাকা সব particle প্রায় তরল অবস্থায় চলে যায় আর আরও অজস্র পরমাণু –তাপের আঁচ কিছু কম হওয়ায়, তারা একটা encashment তৈরী করে।

এবার যখন থেকে ধীরে ধীরে ঐ তরল condensed হতে শুরু করে তখন একধরণের gelatinous mass এর উদ্ভব হয়।

এই পদার্থই যখন earth এর প্রিষ্ঠতল থেকে কখনো কখনো উদগীরণ করে –এরই নাম লাভা।

পরবর্তীতে এটি আরও ঠান্ডা অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং Semi Solid এবং Semi Lequid অবস্থায় আসে এবং জলে ভূমির চরিত্রের কাদা মাটির অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

প্রত্যেকটি স্তরে ক্রমে ক্রমে atomic composition কিছুটা ছিন্ন ছিন্ন রূপ ধারণ করে, যা কেন্দ্রে সর্বাধিক ঘণিভূত অবস্থায় থাকে।

এই বিশাল কাদামাটির মোটা চাদরে cyclone এর মতন নানান অভিঘাত ও ঘূর্ণনের ফলে, যে প্রবল তুফানের condition হয় তা বিশাল উচ্চতায় একবার ওঠে আর আবার নামে... এইভাবে বিশাল

অংশ জুড়ে ঐ তুফান চলে এবং ধীরে যখন গতি কমে আসে ⁕তখন তা বিশাল এক Solid Mass এর সৃষ্টি করে... এইভাবেই পর্বতের উৎপত্তি!
উনি নিজেও এক bay of Biscay তে এমন তুফান তথা cyclone দর্শন করেছেন।

Earth এর সব পর্বতের ⁕এইভাবেই সৃষ্টি!
কল্পের ছাপ পাথরে.. গল্প নয়।

অসাধারণ ধী এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী মহেন্দ্রনাথ dead sea অঞ্চলে সমুদ্রতল থেকে প্রায় ২০০০ ফুট নিচে নেমে অনুসন্ধান চালিয়ে ছিলেন।
ঐ সমুদ্রের সাধারণ গভীরতা ১৩০০ ফুট মতন।
উনি লক্ষ্য করলেন যে এক স্তরের পাথরের ওপর আর এক ভিন্ন গোত্রের পাথর সাজিয়ে সাজিয়ে যেন রাখা হয়েছে।
ওনার সিদ্ধান্ত -ঐ এক এক গোত্রের পাথর -এক একটি কল্পের!!

আমরা এই পাথর নিয়ে নিশ্চয়ই একটি পর্ব রচনা করবো, যেখানে বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হবে।
পূজনীয় নির্মল দা প্রশ্ন করে, অনেক উপকার করেছেন, কারণ এর ফলে বিশ্লেসন বেশি মজবুত ও কার্যকরী হবে।

তবে ঐ পাথরের সৃষ্টির যে প্রযুক্তি মহেন্দ্রনাথ এনে উপস্থিত করেছেন ⁕তা সুদুর্লভ এবং যথাযথ -এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ওনার বায়ু মন্ডলে ঘূর্ণি সৃষ্টির উদাহরণ সহায়, প্রথমে ঠান্ডা হওয়ার রহস্য ভেদ করেছেন আর এরপরে এনেছেন বিভিন্ন চরিত্রের পাথরের চরিত্রের ইতিহাস।

এ ইতিহাস চমকপ্রদ।

আপাতত জানিয়ে রাখছি বিভিন্ন প্রকার motion আর ফলে স্পন্দন পরিবর্তিত হওয়ায়.. নানান গোত্রের পাথরের সৃষ্টি।

এখানে এও উল্লেখ্য, যেমন সব নদীই বহুদূরের পাহাড় থেকে সমতলে নেমে আসে নি, ধরা যাক ছোট নাগপুরের মালভূমি থেকে বেরিয়ে কিছু দূর গিয়ে ঐ জাতীয় অঞ্চলেই কোন বড় নদীর মধ্যে বা নিছক মাটিতেই বা ভুগর্ভেই চলে গিয়েছে।

সেইরকম পাথর, নানান রঙের ও গোত্রের এইসব অঞ্চলে পাওয়া যায়।

এর এক অপূর্ব ইতিহাস আছে বলে মনে করি।

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে আচার্য জগদীশ চন্দ্র তাঁর radio রিসিভর এর detector হিসেবে Gallena Stone, ঐ অঞ্চল থেকেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

প্রণাম গ্রহণ করবেন।
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

অনেকগুলি উপকথা বা গাথা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে পর্বতদের সৃষ্টি কে কেন্দ্র করে।

অল্পকথায় যেগুলো হল,*আগে নাকী পর্বতদের ডানা ছিল বিশাল বিশাল আর সেই ডানা মেলে তারা এখানে ওখানে উড়ে বেড়াতো, এতে ভয় ভীতি অর্থাৎ ত্রাস এর সৃষ্টি হতো মানব মনে, তাই তাদের আকুল প্রার্থনায় দেবরাজ ইন্দ্র প্রচন্ড বজ্রপাত সহায়ে, ঐ পর্বতদের সব ডানা ছিন্ন করেন, আর এর ফলে পর্বতরা বিভিন্ন স্থানে বসে যায়।

দ্বিতীয় গাথা –বিন্ধ পর্বত ক্রমশ উচ্চতা বাড়াতে থাকে, উদ্দেশ্য সূর্যের দিক থেকে আসা কোনো বায়ু বা আকাশ যানের গতি রুদ্ধ করবেন।
এরপর স্বর্গের দেবতারা আগস্থ মুনি কে বলেন –বিন্ধ কে এই কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য, কারণ মুনি ওনার গুরু।

যথারীতি মুনিবর এসে পৌঁছলে.. বিন্ধ সম্মানে তাঁর পদ বন্দনা করেন এবং ওনার আসার হেতু জানতে চান।

মুনিবর বলেন, এখন এই তোমার উচ্চতা বাড়াবার কাজ থেকে বিরত হও –যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি।

এই বলে তিনি ভারতের উত্তরদিকে চলে যান আর কখনই দক্ষিণ ভারতে ফিরে আসেন নি।

পৌরাণিক গল্পের দিক থেকে খুবই আকর্ষণীয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তে বিচার করলে, প্রবল Electrical Discharge (সামান্য হলেও দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রর সঙ্গে তুলনীয়) বিশাল rolling wave এর সৃষ্টি করাতে সমস্ত marl কে এখানে ওখানে বিস্তৃত করতে থাকে আর সেই পূর্বের বর্ণিত ওনার সূত্র অনুসারে ⁕এর ফলে অত্যন্ত বড় মাপের গওহবর এর সৃষ্টিও হওয়াতে, ক্রমে প্রচন্ড ঠান্ডায় ঐ marl জমতে শুরু করে, কিন্তু ঘূর্ণনের চিহ্ন থেকে যায়.. ঐ জমে যাওয়া বিশাল স্তূপ গুলিই আজকের পৃথিবী জোড়া বড় বড় পর্বতসকল!

তাই সমুদ্রের গভীর প্রদেশেও পর্বতের সন্ধান মেলে।

পৃথিবীর মানচিত্র দেখলে সহজেই বোঝা যায়, সারা পৃথিবী কে যেন কিছু বড় বড় পর্বত শ্রেণী বেস্টিত করে রেখেছে।

Arctic region থেকে Altai range, এদিকে Himalayan range, Vindho range, নীলগিরি range, আফ্রিকাতে moon range, South America তে Mount Andis এবং আরও দক্ষিণে আরও কিছু সুউচ্চ শৃঙ্গ।

এই হল অতি সংক্ষেপে পর্বত সৃষ্টির ইতিহাস।

লাভা জমে জমে পর্বত সৃষ্টি তত্ব উনি গ্রহণ করেন নি... কারণ শুধু মাত্র কিছু স্থানীয় অঞ্চলেই ঐ লাভার প্রভাব দর্শন হয়।

উদাহরণ স্বরূপ Cracato যা Celebes এর কাছে এবং অন্যত্রও।
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

চূড়ান্ত অদ্ভুত ব্যাখ্যা পাচ্ছি মহেন্দ্রনাথে!

বলছেন সেই central energy ইলেকট্রিসিটির রহস্য কথা অভাসে ইঙ্গিতে, যার গ্রহণযোগ্যতা আধুনিক অল্প বিদ্যুৎ বিষয়ক জ্ঞানের চর্চার সঙ্গে মিলে যায়।

Electricity র পুরো চরিত্র কারুরই জ্ঞাত এপর্যন্ত নয়।

Smooth কার্যকরী অংশটুকু নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট।
কিন্তু এর যে অনেক অজানা রূপ রয়েছে, টা দৃষ্টির অন্তরালেই থেকে যাচ্ছে, বিশেষত এর ভয়াবহ রূপটির পরিপ্রেক্ষিতে।

প্রবাহের গতি রুদ্ধ হলেই, সে মারাত্মক কান্ড সব ঘটায়।

দু একটা আকাশের ডিসচার্জ ই আমাদের সহ্যের সীমানার বাইরে চলে যায়।

এর তুলনায় যদি massive ডিসচার্জ –তার পরিবাহিকে পর্যন্ত গলিয়ে *তলিয়ে, এমনকি বহুদূরে নিক্ষেপ পর্যন্ত করতে বিন্দুমাত্র সময় নস্ট করে না!

এক ন্যানো সেকেন্ড ও সেখানে এক কোটি বছরের সমান হয়ে দাঁড়ায়।

আগেকার বাড়িতে যে সেই fuse তার থাকতো, সেই কিট কাটের মধ্যে, সেখানে অধিক বিদ্যুৎ সঞ্চারণের ফলে–ঐ ধাতুর তৈরী তারের কি অবস্থা হত –আপনারা অনেকেই জানেন।

এখন MCB এসে যাওয়ায়, এসব আমরা ভুলেই গেছি।

আবার দেখবেন মাঝে মাঝে যে, রাস্তায় Line Transformer থাকে, তাতেও বিশাল কোনো এক আওয়াজ হয়ে –বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।

এটা induction এর ফল।
আবার যে সঞ্চয় করার পদ্ধতি, যার একক farad -আগেও বলেছি সেই di-electric media ও এর সঙ্গে যুক্ত।

যা একটি সহজ গ্রাফ এর মাধ্যমে v/t এই ফর্মুলা দিয়ে দেখানো যায়।

Rate of change of voltage with rate of change of time.

অতএব, আমাদের এই আধুনিক একক গুলির পরিবর্তন করা দরকার.. মহাজাগতিক বিষয়গুলির যথাযথ চিন্তা ভাবনা করতে।

যাই হোক,এমনি কোন সময় প্রবাহের পথ রুদ্ধ হওয়ায় এবং উৎসে অসীম বিদ্যুৎ শক্তির সংযোগ থাকায়... Atmospheric Zone এ এক ভয়ঙ্কর burst হয় আর সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবী বা Earth এর খানিকটা অংশ একেবারে দূরে স্বয়ংক্রিয় ভাবেই নিক্ষেপিত হয়... এটিই বর্তমানের Moon বা চন্দ্র! 🎇

প্রথম অবস্থায়, ঐ marl condition থেকে যখন condenced হয়ে সবে solid হয়েছে –এই পৃথিবী... তখন না ছিল সুউচ্চ পর্বত আর না মহাসমুদ্র।

শুধুই ছিল এক ক্ষেত্র।

পর্বত উৎপত্তির সামান্য আলোচনা আগে হয়েছে, তাই এবার ঐ মহেন্দ্র ব্যাখ্যা সহায়ে মহাসমুদ্রের উৎপত্তি বর্ণন।

যে মুহূর্তে জায়গা খালি হল, অর্থাৎ এক বিশাল cavity তৈরী হল –সেখানে তাপের ফলে solid স্তর অতি গভীর খাতে চলে গেল এবং সেখানে সঙ্গে নিয়ে গেল বেশ কিছু পর্বতের অংশকেও।

এই অতি গভীর খাত গুলিই আজকের মহাসমুদ্র।

আর তাই বলছেন, ocean bed rocky!

মহাসমুদ্রের ভেতরও সবাই জানেন অনেক উঁচ উঁচ পর্বত বর্তমান।

যে Satellite Imaje Analysis, particularly,Remote Sensing Satellite থেকে প্রাপ্ত তথ্যর ভিত্তিতে করা হয় বা Sonar dieo করা হয়, তাতে সব data প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়, কারণ কোনো info capturing tool ই Ocean Bed penetrate kore Data দেয় না।

আমাদের ক্রমশ Earth এর কেন্দ্রের অভিমুখে চলতে হবে।
চাই নতুন গবেষণা..
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

সেই যে দণ্ডের মাধ্যমে দেবতা আর অসুররা মিলে সমুদ্রের তলোদেশ থেকে অমৃত মন্থন করতে লেগে গেল আর আর দন্ড জড়িয়ে নাকী অনন্ত নাগ ঘুরতে লাগলো.. হঠাৎ সেই সময় প্রায় এক সংঘর্ষ উপস্থিত, মানে প্রকৃতি স্বাভাবিক পর্যায়ে নেই আর তখনই দেখা গেল ⁕কি যেন ঐ সমুদ্র থেকে আকাশে খুব উঁচুতে উঠে গেল, ঘোর রাত্রিতে দেখা গেল আকাশে আলো!

অবাক হয়ে গেল সবাই.. এটা কীসের আলো?
আরে ঐ তো আকাশে একটা যেন ছোট সূর্য উঠেছে।
পরে ঐ ছোট সূর্যের নাম হল চন্দ্র!

এই যে কল্প-গল্প কাহিনী.. এও এক রূপকের আশ্রয়ে চন্দ্রের উৎপত্তির কারণ বিবরণ।

আসলে যে প্রবল Electric Discharge হয় তাতে বিশাল capacitance develop করে আর জল ও সমুদ্রের, কিছুটা marl অবস্থা bed থেকে নিয়ে spiral গতিতে বহু দূরে নিক্ষেপিত হয় এবং ঐ উচ্চ স্তরে প্রবল ঠান্ডায় জমে যায় শীঘ্রই আর রিফ্লেট করতে শুরু করে সৌর আলো, তার মানে প্রমাণিত হল.. এই পৃথিবী থেকেই চন্দ্রের উৎপত্তি।

প্রশ্ন আসবে সমুদ্রে জল এলো কোথা থেকে?

মহেন্দ্র ভাবনায় ও দর্শনে কিছুই বাদ যায় নি।
এ রূপকথা নয় ⁕সত্য কথা... আমাদের উপলব্ধি ও গবেষণা করে বুঝতেই হবে.. এ আমাদের জাতীয় জ্ঞান।

এই জ্ঞান পাবার জন্য সারা পৃথিবী ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

স্বামীজী আগেই বলে দিয়েছেন... এই জ্ঞানালোক ভারতেই আছে।

জগৎ কুলো কুন্ডলিনি শক্তির শ্রী শ্রী ঠাকুরের মাধ্যমে জাগরণ, এই বোঝার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে।

মহেন্দ্র নাথ এবার চলে এলেন সরাসরি জলের সৃষ্টির কথা বলতে।

আকাশে তো মেঘ -সেও নেই, এমনকি একুউস vapour তাও নেই... তাহলে জল?

হ্যাঁ, ঐ যে central energy *সেই এর আদি কারণ... কেন্দ্রের কাছে নয় কিছুটা solid অবস্থা বা ক্ষেত্র পাওয়া গেছে, কিন্তু atmospheric zone যেখান পরমাণু ওতো ঘণিভূত নয়, সেখানকার vibration কি এক হতে পারে?
কখনোই নয়।

ফলত, কেন্দ্র তার অতি আকর্ষণী শক্তির মাধ্যমে ক্রমাগত নিজের দিকে টানতে থাকায়, বহু বহু অন্যান্য vibration, motion ও curveture এর সৃষ্টি হচ্ছে।

ক্রমে এর ফলে কুয়াশা বা এক ধুমাইতো অবস্থার সৃষ্টি, যা এবার দর্শন যোগ্য –এই vapour।

পরবর্তীতে ঐ ঘণিভূত vapour কেও কেন্দ্র আকর্ষণ করতে থাকায়.. সমুদ্র বা খালি গওভর এর মধ্যেও ঘূর্ণনের সৃষ্টি, অর্থাৎ, ওপরে একজাতীয় vapour এর vibration এর অন্দরে আর এক জাতীয় vibration... এই দুই vibration এর মিলিত ফলেই ⁕জলের সৃষ্টি!

তখন পৃথিবী বা গ্লোবের আকার এতো বড় মোটেই ছিল না.. অনেক ছোট ছিল, কারণ ভাবের সংখ্যা ছিল কম..
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

এবার একটু বলছেন সমুদ্রের উৎপত্তির কারণ... একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, যে কোনো দুটো continent এর ভেতর একটা holo অংশ রয়েছে, আসলে এগুলোকে depressed land আখ্যাও স্বচ্ছন্দে দেওয়া যায়, এখানেও অনেক ক্ষেত্রেই, ঐ depressed field এর গভীরে –নানান পর্বতের দর্শন মেলে।

আবার গলিত আদি পদার্থ কখনো কখনো ওপরে উঠে আসায়.. আশপাশের জায়গা depressed বা low হয়ে যায়।

যে সব স্থান hollow ছিল, তা জলপূর্ণ হওয়াতেই –সমুদ্রের সৃষ্টি।

Eddy র প্রসঙ্গও নিয়ে এসেছেন, ওনার বক্তব্য অনুসারে
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

এবার একটু বলছেন সমুদ্রের উৎপত্তির কারণ... একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, যে কোনো দুটো continent এর ভেতর একটা holo অংশ রয়েছে, আসলে এগুলোকে depressed land আখ্যাও স্বচ্ছন্দে দেওয়া যায়, এখানেও অনেক ক্ষেত্রেই, ঐ depressed field এর গভীরে –নানান পর্বতের দর্শন মেলে।

আবার গলিত আদি পদার্থ কখনো কখনো ওপরে উঠে আসায়.. আশপাশের জায়গা depressed বা low হয়ে যায়।

যে সব স্থান hollow ছিল, তা জলপূর্ণ হওয়াতেই –সমুদ্রের সৃষ্টি।

Eddy র প্রসঙ্গও নিয়ে এসেছেন, ওনার বক্তব্য অনুসারে ⁕এই তত্ত্বর নানান ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তার ভেতর সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বলছি –সোজা কথায়, slow moving water area কে Eddy বলা হয়।

আসলে একদিক থেকে এটা চাপের একক ও বটে।

এর সঙ্গে উষ্ণতার সম্পর্ক এবং ভূমির সম্পর্কও রয়েছে।

মহেন্দ্রনাথ এক্ষনে সমুদ্রের সৃষ্টির কাহিনী শোনাচ্ছেন –অতি গভীর মহাসমুদ্র নয়।

এরপর উনি চলে যাবেন, বিভিন্ন পাথরের বিশ্লেসন তথা stone এর সৃষ্টি থেকে আধুনিক বর্ণছটা সমৃদ্ধ নানান stone এর ব্যাখ্যায়।

কারণ হিসেবে দর্শীয়েছেন ভাইব্রেশন এর নানান মাত্রা ও পরিবর্তন কে।

আধুনিক বিজ্ঞান এই Vibration সম্মন্ধে যতটুকু জানে, তাতে তার একক G স্থির করেছে।

এই vibration যেহেতু সর্বমুখী বলে ধারণা করা হয়, অতএব একটা গ্লোবের তিনটে তলের মতন – এরও তিনটে তল পরিমাপ করে averaging করে একটা value তে এসে, তাকে রেজাল্ট হিসেবে ধরা হয়।

তাই আধুনিক সব Vibration Smart Sensor গুলিতে তিনটি output terminal থাকে।

এবার যদি আমরা মহেন্দ্র Constant বলে একটি এককের সৃষ্টি করি, ধরা যাক MV*তাহলে কেমন হয়?

এই M stands for the name of Mohendranath as well as Mind আর V for Vibration.

খুলে বলি আজ পর্যন্ত Mind এর Vibration ঠিক মতন ব্যাপার, অর্থাৎ যন্ত্রাদি কিছুই নেই সারা পৃথিবীতে, কিন্তূ ওটা এখন আমাদের খুব প্রয়োজন।

যত টেরা বা Giga Hertz ই হোক… Mind এর Vibration তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী, তাই কোনো যন্ত্রেই এটিকে ধরা যায় না, বহু গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ এর পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

আমরা Light এবং পাশাপাশি Electricity র গতি কে সাধারণভাবে সবচেয়ে দ্রুত ধরে নিয়ে কাজ এখনো পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। যদিও অন্যান্য নানান তত্ব উঠে এসেছে, যেখানে Einstein এর তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেওছে।

সব ঠিক আছে, কিন্তূ মন বা মনের Vibration নিয়ে কোনো কথা নেই, কোনো গবেষণা পত্রে বিশেষরূপে।

আমরা ভারত থেকে মহেন্দ্রনাথের তত্ব ভিত্তি করে, একটি প্রাথমিক সিদ্ধান্তে এখনই উপনীত হতে পারি।

আগে মন সৃষ্টি হলো, না, আলো, না বিদ্যুৎ… কোনটা?

যদি মন বা Mind বলে কিছুই না থাকতো.. বাকি দুটির ধারণা কি আমরা করতে পারতুম?

মনে হয় না (সেই মন থেকেই উত্তর পেলাম তো!)

তাহলে আগে Mind বা মন কে বসাতে আপত্তি থাকার অসুবিধা নেই।

যে উৎস থেকে অন্য দুটি গুণ ও তাদের গতি সম্মন্ধে মান নির্ণয় করছি, অবশ্যই মন বা Mind এর অবস্থান ওগুলির চেয়ে উচ্চতে তা স্বয়ংসিদ্ধ *তাই না?

তাহলে মনের গতিবেগ কে সর্বোচ্চ স্থান কি দিতে পারা যায় না?

এইরকম কাছাকাছি কি একটা সমীকরণ করা কি সম্ভব নয় -

M= near to infinity *I...
মহেন্দ্র বিজ্ঞান দর্শন

Earth নিজেই এক অতিবিশাল ম্যাগনেট, এই অর্থে যে, সমস্ত Atmospheric Zone এর floating এবং এমনকি semi solid থেকে solid mass কেও -নিজের দিকে, বিশেষত কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে।

এর ফলেই নানান পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি এবং প্রাচীন ইতিহাসেরও সন্ধান পাই।

প্রত্যেক কল্পের stone এর নেচার আলাদা, পরিষ্কারভাবে distinguish করা যায় *দুটি স্তরের ভেতর একটা line দেখতে পেলেই।

Cavity যেমন outer space এ হয়, ঠিক তেমনি হয় পৃথিবী পৃষ্ঠেও।

মোট কথা, ঐ সেই প্রবল আকর্ষণের ফলে, পরমাণুর দল ছুটতে থাকে কেন্দ্র অভিমুখী হয়ে আর যে গাওভর সৃষ্টি হয়, সেখানে প্রবল ঘুর্ণন ও স্পন্দন হয়।

কেন্দ্র যত আকর্ষণ করে, ততই floating পরমাণুরা জমাট বাঁধতে শুরু করে এবং ক্রমে একেবারে solid mass এ converted হয়।

এখানেই শেষ নয়, এই ক্রিয়া চলতে থাকায়, ক্রমশ নিচে চলে যেতে থাকে -ঐ mass, কারণ, এক to আকর্ষণী শক্তি আর দুই -চাপ।
ফল দাঁড়ায়, যতই ভেতর দিকে যায় ঐ mass, ততই hard হয়ে যায়.. তাই earth এর গভীর স্তরে আমরা শিলা পেয়ে থাকি।

এতো গেল পাথর বা stone আর শিলা তৈরির ইতিহাস *earth এর অন্দরে, কিন্তু পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপরে, বিভিন্ন পর্বতে যে পাথরের দেখা মেলে.. তার কথা?

আছে, উনি তাও শুনিয়েছেন।

এক to বিশেষ অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন Volcanic Eeruption নিয়ে, এবার চলে এসেছেন Mount Lebanon - Damascus এর কাছে।
এখানে পরিষ্কার উনি পাথরের নানান অতি প্রাচীন স্তর, যা বিভিন্ন কল্পে গঠিত এবং তাদের অজস্র variety দর্শন করেন।

Himalayan Belt a এসে খুঁজে pelen*বিশেষত lime stone, slate এবং আরও বহু ধরণের পাথর।

যে পাথরের আপাত স্তর স্থির হয়েছে তার ওপর outside থেকে যেমন প্রচন্ড pressure রয়েছে, ঠিক তেমনি gyration এর ফলে --অতি গভীর প্রদেশ থেকেও আসছে প্রচন্ড pressure ±এই দুটির direction কিন্তূ ঠিক opposite *ফল দাঁড়িয়েছে Atomic Particle রা প্রভুত pressed হয়ে আরও solidified হয়ে গেছে।

আরও অদ্ভুত কথা শুনিয়েছেন ⁕এই দুই opossite current এর ভেতর.. যা কিছুর উদ্ভভ °সেটাই একটি 'কল্প'!

টিকা :দার্শনিক এর দৃষ্টিভঙ্গিতে যা বলেছেন, তাকে ছোট ছোট করে পরীক্ষা করে, ব্যাখ্যা সহায়ে উপস্থিত করলে এক নতুন জীবনদায়ী মহা-বিজ্ঞান যে হবেই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।